রসাঞ্জন

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০-১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসাঞ্জন

শ্রীরায়গোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ চৈত্র

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩.১

সূচী

ভূমিকা

গাছপালা থেকে তৈরি ওষুধের ব্যবহার স্মরণাতীত যুগ থেকে চলে আসছে। বেদে গাছপালাজাত অনেক ভেষজের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উপক্ষার প্রসবিনী গাছের কথা বলা যেতে পারে। উপক্ষার কথাটি আজকালকার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অনুসারে গঠিত। 'ক্ষার' শব্দটি পুরানো, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও ব্যবহার আছে। ক্ষার শব্দটির ইংরেজি হল অ্যালকালি (Alkali)। গাছ থেকে কতকগুলি পদার্থ পাওয়া যায় যার রাসায়নিক গুণ অনেক অংশে ক্ষারের রাসায়নিক গুণের মত। এগুলি সবই কারবন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন ঘটিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের অণুতে অক্সিজেনও বর্তমান আছে। ইংরেজিতে এদের বলে অ্যালকালয়েড (Alkaloid), আমরা বলি উপক্ষার। বেদোক্ত[১] গাছের মধ্যে যেমন ভাঙ্গ বা আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞান মতে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ভার স্যাটাইভাতে *(Cannabis indica* var. *sativa)* ট্রিগোনেলিন নামক উপক্ষার আছে। বিল্বতে *(Aegle marmelos)* আছে স্কিমিয়ানিন নামক উপক্ষার। তিল্বকে *(Symplocos racemosa)* আছে হার্মান, আর এরণ্ডতে *(Ricinus communis)* রিসিনিন।[২]

চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় বহু গাছপালাজাত ওষুধের গুণাগুণ বর্ণিত আছে। এ দুটিতেই রসাঞ্জনের বা দারুহরিদ্রাগাছের বল্কলের সত্ত্বের ভেষজ গুণাগুণ সবিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালের বৈদ্যেরা, যেমন বাগভট, চক্রপাণি, শার্ঙ্গধর, ভাবমিশ্র প্রভৃতি, আরও অনেক নূতন নূতন গাছপালার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে গেছেন।

আমাদের দেশ থেকে যেসব পণ্য ও ভেষজ অন্য দেশে রপ্তানি হত বা অন্য দেশ থেকে আমদানি হত তার উপর শুল্ক নির্ধারণের ব্যবস্থা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেওয়া আছে। এটিতে উপক্ষার প্রসবিনী অনেক গাছের উপরে শুল্ক নির্ধারণের কথাও আছে। যেমন, দারুহরিদ্রা বা কালেয়ক (বর্তমানে *Berberis asiatica* বা অন্যান্য প্রকারের *Berberis* বা *Mahonia* বলে পরিচিত); এতে বার্বেরিন নামক উপক্ষার আছে। এই উপক্ষারের ভেষজগুণের জন্য দারুহরিদ্রা সত্ত্ব বা রসাঞ্জন এত ফলপ্রদ বলে প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আরও আছে কাকমেচক (*Solanum indicum*), এর উপক্ষারের নাম সোলানিন; দাড়িম্ব, এর উপক্ষার হল পেলেটিয়ারিন; লোধ্র বা বেদোক্ত তিল্বক (*Symplocos racemosa*) ও বিষ বা বর্তমান যুগের অ্যাকোনাইট।[৩]

খৃস্টপূর্ব বৈদিক বা আয়ুর্বৈদিক যুগের সঠিক কাল অনুমান করতে না পারলেও খৃস্টোত্তর যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের সময় সঠিক নির্দেশ করা যায়। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসতেন।[৪] বিবিধ ভেষজ, বীজ তৈল, নানাবিধ রঞ্জনদ্রব্য ভারতবর্ষের বন্দর থেকে রপ্তানি হত। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হওয়া অনেক ভেষজের নাম করেছেন, তার মধ্যে রসাঞ্জন অন্যতম। বলা বাহুল্য বৌদ্ধযুগে ভারতীয় ভেষজের গুণাগুণ যথেষ্ট পরিমাণে আলোচিত হয়েছিল এবং মুসলমান আমলেও হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৬৩) পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া থেকে পর্তুগীজ চিকিৎসক গার্সিয়া দা অর্টা (Garcia da Orta) ভারতীয় ভেষজের গুণাগুণ বর্ণনা করে এক গ্রন্থ রচনা করেন। পরে সিম্পলস্ অ্যাণ্ড ড্রাগস্ অব্ ইণ্ডিয়া

(*Simples and Drugs of India*) নাম দিয়ে এর ইংরাজি অনুবাদ হয়।[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে আয়ুর্বেদোক্ত গাছপালার রাসায়নিক ও আধুনিক মতে ভেষজগুণ পরীক্ষার প্রথম সূচনা হয়, রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ওসাগ্নেসির তত্ত্বাবধানে। এইসকল গবেষণার ফলাফল ১৮৪০ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ফার্মাকোপিয়ায় লিপিবদ্ধ হয়। এদেশে গাছপালার রাসায়নিক পরীক্ষার প্রথম যুগে কানাইলাল দের নাম করা যেতে পারে। ইনি ভারতীয় আফিমে পরফাইরক্সিন (Porphyroxin) নামক উপক্ষার আছে কি না, তা পরীক্ষা করবার প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন।[৬] আফিমের উপক্ষার রাসায়নিক প্রণালীতে নিষ্কাশন করেছিলেন ডেরোস্নে (Derosne) ১৮০৩ সালে।[২] এর দু বছর পরে ডেরোস্নের গবেষণার কথা অবগত না হয়েও সারটুর্নের (Serturner) আফিমজাত উপক্ষার আবিষ্কার করেন ও নাম দেন মর্ফিয়ম।[২] ১৮১৮ সালে পেলেটিএ (Pelletier) আর কাভেন্টু (Caventou) নক্স্ভোমিকা বা কুচিলার বীজ থেকে স্ট্রিকনিন ও আর এক বছর পরে ঐ বীজ থেকেই ব্রুসিন উপক্ষার আবিষ্কার করেন।[২] ১৮২০ সালে এঁরা সিনকোনার ছাল থেকে কুইনিন আবিষ্কার করে যশস্বী হন।[২] গাছপালায় থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলির জন্য গাছপালার ভেষজগুণ প্রকাশ পায় বলে এ দেশীয় পাছপালা থেকে বিভিন্ন ভেষজগুণ সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অনেক গাছ ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েও পরীক্ষা করা হয়। এসকল গবেষণার ফলাফল ডাইমকের (Dymock) সম্পাদনায় ফার্মাকোগ্রাফিকা ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।[৭] ১৮৩৭ সালে রয়েল (Royle) লণ্ডনে হিন্দু

চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, পরে বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে দি অ্যান্টিকুইটি অব্ হিন্দু মেডিসিন (*The Antiquity of Hindu Medicine*) নামে প্রকাশিত হয়। রয়েল হিন্দু ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রাচীনতা দেখিয়েছিলেন আর তার উপর অনেক ভেষজ নিজে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিলেন।[৮] তিনি এ দেশীয় রসাঞ্জন ও গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের লাইসিয়ম (Lycium) একই বস্তু বলে প্রতিপন্ন করেন।[৯] বলা বাহুল্য এর অনেককাল পরেও ইউরোপবাসী ভারতীয় সংস্কৃতিকে ততটা আমল দেন নি। ১৮৬২ সালে বার্বেরিস-জাত উপক্ষার বার্বেরিনের ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ করে পেরিন্স বললেন[১০] সুসভ্য গ্রীক, অর্ধসভ্য চীন ও হিন্দু জাতি, উত্তর আমেরিকার ও আফ্রিকার অধিবাসীরা সকলেই বার্বেরিন ভেষজ হিসাবে ব্যবহার করে। রয়েলের দারুহরিদ্রার প্রাচীন ব্যবহার ও গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রভাব সম্বন্ধে রচনা বোধ করি পেরিন্স গ্রাহ্য করেন নি।

উপক্ষার সম্বন্ধে রাসায়নিক গবেষণার গোড়ার দিকে কেবলমাত্র মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে গাছপালা থেকে উপক্ষার আহরণের চেষ্টা চলে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আজও গাছপালার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়। ১৯৩৪ সালে ওরেকফ (Orekhov) রাশিয়া-জাত অনেক গাছপালার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে সাতষট্টিটি উপক্ষার প্রসবিনী গাছ আবিষ্কার করেন; তার মধ্যে বারোটি গাছ থেকে চব্বিশটি নূতন উপক্ষার নিষ্কাশন করেন; এবং ঐ চব্বিশটির মধ্যে দুটি মানুষের উপকারে আসে। একটির নাম এনাবেসিন, এটি গাছপালার পোকা উচ্ছেদ করতে পারে; অপরটির নাম কনভলভিন, এটি চক্ষুরোগের বিশেষ ফলপ্রদ।[১১]

উপক্ষারের উপর গবেষণার বিভিন্ন দিক আছে। উপক্ষারের জন্য গাছের চাষ করার প্রয়োজন হয়। উপরন্তু যাতে ঐ গাছে বেশি পরিমাণে উপক্ষার জন্মাতে পারে তার জন্য সেই মত সার দিতে হয়। কুইনিন উপক্ষার ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ওষুধ। কুইনিন প্রসবিনী সিনকোনা গাছের আদি বাসস্থান হল দক্ষিণ আমেরিকায়। চেষ্টা করে সিনকোনার চাষ করা হয়েছে যবদ্বীপে, বাংলাদেশে ও মাদ্রাজে। বৈজ্ঞানিক মতে চাষ করে সিনকোনার কুইনিনের পরিমাণ বাড়ানো গেছে।[১২] হায়োসিয়ামাস্ (*Hyoscyamus*), অ্যাট্রোপা (*Atropa*) ও আমাদের দেশের ধুতুরায় (*Datura stramonium*) হায়োসিয়ামিন উপক্ষার আছে। এর থেকে চক্ষুচিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যাট্রোপিন উপক্ষার তৈরি হয়। অ্যাট্রোপা বেলেডোনা গাছ (*Atropa belladonna*) ও ধুতুরার চাষ করে উপক্ষারের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়ানো গেছে।[২]

এক দল বিজ্ঞানী প্রয়োজনীয়তার দিকে তত জোর না দিয়ে আবিষ্কারের কৌতূহলের দিকটা বাড়িয়ে তুললেন। তাঁরা গাছপালাজাত উপক্ষারগুলির অণুর গঠন নিয়ে গবেষণা করতে গেলেন। এ ধরনের গবেষণা ইউরোপে আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে।[২] এখন আমরা উপক্ষারের বিভিন্ন কাঠামো অনুসারে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। যেমন রসাঞ্জন বা দারুহরিদ্রাস্থিত উপক্ষার বার্বেরিনকে বলি আইসোকুইনোলিন উপক্ষার। কুইনিনকে বলি কুইনোলিন উপক্ষার। উপক্ষারগুলিকে রাসায়নিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করে যেমন তাদের অণুর গঠন সম্বন্ধে অনুমান করা গেল, অমনি চেষ্টা চলতে লাগল কি করে পরীক্ষাগারে সেগুলিকে সংশ্লেষিত করা যায়। বিজ্ঞানীদের কৌতূহল আরও বেড়ে যেতে লাগল। তাঁরা উপক্ষারের গঠন অনুসরণ করে ঐ রকম বা ঐ জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষাগারে

তৈরি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যাঁরা ঐসব রাসায়নিক পদার্থ মানুষের কাজে লাগাবার কথা বড় করে ভাবেন, তাঁরা এই গবেষণাগুলির মোড় ফিরিয়ে নিলেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন, উপক্ষারের মত রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করতে, যা মানুষের উপকারে লাগবে। ফলে কুইনিনের অনুকরণে প্রস্তুত হল ম্যালেরিয়ানাশক অ্যাটাব্রিন ও প্লাসমোচিন। বেদনানাশক হিসাবে কোকেন উপক্ষার বেশ নাম-করা। তার অনুসরণে তৈরি হল নোভোকেন; পিপারিডিন উপক্ষারের অনুকরণে তৈরি হয়েছে ডেমারল, যার বেদনানাশক গুণ মরফিয়ার সঙ্গে তুল্য।

শুধু প্রয়োজনীয়তার মুখ চেয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল নিবৃত্ত হল না। প্রশ্ন উঠল, গাছে উপক্ষার জন্মায় কেন। ১৯০৫ সালে এর সদুত্তর প্রথম দিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী পিক্‌টে। তিনি বললেন, জীবজন্তু যেমন মলমূত্রাকারে আহার্যের বর্জনীয় অংশ ত্যাগ করে, তেমনই কোনো কোনো গাছ উপক্ষার আকারে আহার্যের বর্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করে। তাঁর মতে গাছপালা প্রোটিন আত্তীকরণ করতে গিয়ে বৃহত্তর প্রোটিনের অণুকে নাইট্রোজেন-ঘটিত অ্যামিনোঅ্যাসিড কিম্বা কোনো কোনো সময় অ্যামিনের ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত করে। অমিনোঅ্যাসিডগুলি পরে রাসায়নিক রূপায়নে উপক্ষার রূপে গাছপালার কোষে সঞ্চিত হয়।[১৩] পরে সেখান থেকে পরিত্যক্ত হয়। যেমন, যদি ত্বক বা পত্রের কোষে সঞ্চিত হয় তো কালে ত্বক বা পত্র ঝরার সঙ্গে উপক্ষারগুলিও বর্জিত হয়। পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত দিতে পেরেছেন। দারুহরিদ্রার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, উপক্ষারগুলি সত্যই দারুহরিদ্রার বর্জনীয় পদার্থ।[১৪]

এই পুস্তিকা রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী শ্রীচারুচন্দ্র

ভট্টাচার্য। আয়ুর্বেদ থেকে দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন সংক্রান্ত উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করেছেন পণ্ডিত বনমালী দত্তশর্মা। উদ্ভিদতত্ত্বগত উপকরণ সংকলনের নির্দেশ দিয়েছেন শিবপুর বাগানের হার্বেরিয়ম অধ্যক্ষ ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। ছবি এঁকে দিয়েছেন শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুযোগে এঁদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করছি।

প্রারম্ভ

রসাঞ্জন একটি প্রাচীন ওষুধ। আয়ুর্বেদে এর বহুল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। দারুহরিদ্রা নামে এক জাতের কাঁটা গাছ থেকে রসাঞ্জন তৈরি করা হয়। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে দুই হাজার ফুট উঁচু জায়গা থেকে ষোলো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে দারুহরিদ্রার বিভিন্ন প্রকারের গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এর মধ্যে কোন্ বিশেষ জাতির গাছ আয়ুর্বেদের দারুহরিদ্রা, তা নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করা হল যে, দারুহরিদ্রা সম্ভবত উদ্ভিদতত্ত্বের বার্বেরিস এশিয়াটিকা (*Berberis asiatica*)। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ওয়ালিশ (Wallich) ১৮১৮ সালে এই জাতের একটি গাছের পল্লব নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন ও ১৮২১ সালে রক্সবরা (Roxburgh) এটির উক্ত নাম দেন।

১৮৩৭ সালে বর্তমান শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন ও তখনকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষ রয়েল পঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রমণকালে অনেক জাতির বার্বেরিস জন্মেছে দেখেন ও জানতে পারেন ঐসব গাছেরই ত্বক থেকে রসাঞ্জন নামক চক্ষুরোগের বিখ্যাত দেশজ ওষুধ তৈরি হয়।[৮] ইউরোপে বার্বেরিস ভুলগারিস (*Berberis vulgaris*) বলে এক জাতের বার্বেরিস খুব বেশি জন্মায়। ১৮৩৭ সালে বুকনার তার থেকে বার্বেরিন নামে এক হলুদ রংয়ের উপক্ষার আবিষ্কার করেন।[১৫] রয়েল অবশ্য রাসায়নিক প্রণালীতে ভারতীয় বাবেরিস থেকে উপক্ষার আবিষ্কার বা নিষ্কাশনের দিকে যান নি। তিনি আয়ুর্বেদ উল্লিখিত মতে রসাঞ্জন প্রস্তুত করে আধুনিক মতে তার ভেষজ গুণ পরীক্ষা করেন, এবং এটি চক্ষুর ফুলা রোগের জন্য সত্যই অব্যর্থ বলে মনে করেন। ওয়াট

ইকনমিক প্রডাক্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া নামক সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদনার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের চিকিৎসালয়ে আয়ুর্বেদ-উক্ত ভেষজগুলির আধুনিক মতে পরীক্ষা করান। তখনকার সরকারী চিকিৎসকেরা রসাঞ্জনের আয়ুর্বেদ-বর্ণিত গুণ সত্য বলে প্রমাণিত করেন।[১৬]

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রসাঞ্জন সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের বেশির ভাগ নিজস্ব গবেষণার কথা উল্লিখিত হয়েছে। রসাঞ্জন প্রয়োগের প্রাচীনতা, ও আরব গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশে তার প্রচলনের তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতবর্ষে কত প্রকারের বার্বেরিস আছে তার বিস্তারিত তালিকা আছে। বার্বেরিন উপক্ষার অন্য কি কি গাছ থেকে পাওয়া যায় তারও উল্লেখ আছে। কোন্ গাছ থেকে কত পরিমাণ বার্বেরিন পাওয়া যায় তাও রাসায়নিক পরীক্ষা করে স্থির করা হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদসংগ্রহকারকদের গাছের নমুনাসহ সংগ্রহের স্থান কাল ইত্যাদির তালিকা থেকে বার্বেরিন বিদ্যমান-থাকা দেশজ গাছগুলি কোন্ কোন্ প্রদেশে, বিশেষ করে কোন্ স্থানে লভ্য তা নির্ধারিত হয়েছে। উপরন্তু ভারতবর্ষজাত বিভিন্ন জাতের বার্বেরিসের ও বার্বেরিন প্রসবিনী বিভিন্ন গাছের রাসায়নিক পরীক্ষার ইতিবৃত্ত এই পুস্তিকাটিতে সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল বার্বেরিন নয়, অন্যান্য পাঁচ-ছয় রকমের উপক্ষারও এইসকল গাছের শিকড় থেকে নিষ্কাশন করা হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি নূতন উপক্ষার বর্তমান লেখক আবিষ্কার করেছেন; এই দুটির নাম আম্বেলাটিন ও নেপরোটিন। আম্বেলাটিন সবপ্রথম পাওয়া যায় বার্বেরিস আম্বেলাটা[১৭] থেকে; নেপরোটিন মাহোনিয়া নেপালেনসিস[১৮] থেকে। এই দুইটি উপক্ষারের অণুর গঠনেরও সিদ্ধান্ত করা গেছে। আম্বেলাটিনের ভেষজগুণ পরীক্ষা করেছেন ডাক্তার কহালি, স্কুল অব্ ট্রপিকেল মেডিসিনে। তাঁর মতে

আম্বেলাটিন বার্বেরিনের মতই বিভিন্ন রোগে ফলপ্রদ, বিশেষ করে ওরিয়েণ্টল সোর্ নামক ক্ষতে,[১৩] যার, বলতে গেলে, আজ পর্যন্ত জানা ছিল কেবল বার্বেরিনই একমাত্র অমোঘ ওষুধ।

উপক্ষার একটা গাছের বিভিন্ন অংশে, যেমন মূলত্বক কাণ্ড পুষ্প বা ফলে জন্মায় কেন, এ নিয়ে অনেক গবেষণা বিভিন্ন দেশে হয়েছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতের বার্বেরিস, বিশেষ করে মাহোনিয়া নেপালেনসিস নামক গাছটি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে।[১৪] দেখা গেছে, দারুহরিদ্রার গোষ্ঠিতে বার্বেরিন বা অন্যান্য উপক্ষার গাছের বর্জনীয় অংশ, সঞ্চিত খাদ্য নয়। দারুহরিদ্রার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত, উদ্ভিদতাত্ত্বিক জ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান-সম্মত আবিষ্কারের কাজ আজও শেষ হয় নি। গাছপালার রসায়ন বিজ্ঞানের বহু বিস্ময়কর রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, যা উত্তরকালের রসায়নবিদের, হয়তো বা জনসাধারণেরও, কাজে লাগবে।

দারুহরিদ্রার প্রয়োগ

রসাঞ্জনের ভেষজগুণ ও ব্যবহারের কথা সুশ্রুত ও চরকসংহিতায় আছে। এমনকি পরবর্তীকালের আয়ুর্বেদ বিশারদরা রসাঞ্জনের বহু গুণ বর্ণনা করেছেন। সংগ্রহকারক হিসাবে বাগভট বিশেষ নামকরা। ইনি অষ্টাঙ্গ হৃদয় রচনা করেছিলেন। খুব সম্ভব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁর রচনায় রসাঞ্জনের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীতে চক্রপাণি সংগ্রহকারক হিসাবে বিখ্যাত হন। চক্রপাণি চক্রদত্ত নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-সংগ্রহ রচনা করেছিলেন। ইনিও রসাঞ্জনের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। [illegible] শতাব্দীর শার্ঙ্গধর

সংহিতায় দারুহরিদ্রা ঘটিত তৈলের বিশেষ ব্যবহারের কথা আছে। সবশেষে ষোড়শ শতাব্দীকালে ভাবমিশ্রের কথা বলতে হয়। ইনিও একজন বিখ্যাত সংগ্রহকারক। ইনিও চরক, সুশ্রুত ও অন্যান্য চিকিৎসকের পন্থা অনুসরণ করে রসাঞ্জনকে ভালো ওষুধ বলে প্রতিপন্ন করেছেন।[২০]

সুশ্রুত রসাঞ্জন ও দারুহরিদ্রার বিবিধ মুখ্য ও গৌণ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। গত উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসকেরাও আধুনিক ইউরোপীয় মতে পরীক্ষা করে উক্ত রসাঞ্জনের গুণাগুণের যাথার্থ্য সুপ্রমাণিত করেন। সুশ্রুত দারুহরিদ্রাকে কফপিত্তার্তিনাশন, কুষ্ঠ-ক্রিমিহর ও দুষ্টব্রণ-বিশোধন বলেছেন; আবার স্তন্য-বিশোধনে, আমাতিসারে ও উদরের পীড়ায় ব্যবহার করতে বলেছেন।[২১] উপরন্তু দারুহরিদ্রার সত্ত্ব ঘটিত তৈল গণ্ডমালা ও মেহরোগে ফলপ্রদ বলে উল্লেখ করেছেন, ভগন্দর-বিনাশক বলেছেন। চক্ষুরোগে অঞ্জন হিসাবে দার্বীর বা দারুহরিদ্রার ক্বাথ বিশেষ উপকারী, চর্মরোগেও ফলপ্রদ।[২২]

চরক দারুহরিদ্রাকে এর উপর অর্শোঘ্ন বলেছেন, মুখশোধক বলেছেন।[২৩] পূর্বতুর্কীস্থানে কাছারে 'বাওয়ার পাণ্ডুলিপি' আবিষ্কৃত হয়। এই পাণ্ডুলিপিতে পূর্ব পূর্ব মহর্ষিদের বিশিষ্ট ওষুধগুলি ও তাদের ব্যবহারের সংকলন বর্ণিত আছে। এই সংকলনের নাম 'নবনীতক'। হ্বার্ণালি বাওয়ার পাণ্ডুলিপির কাল আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দী বলে নির্দেশ করেছেন। নবনীতকে দারুহরিদ্রা চক্ষু, পিত্ত, চর্ম ও ক্ষত-রোগে, মুখব্রণতে বিশেষ উপকারী ও কণ্ঠরোগ প্রশমণ বলা হয়েছে।[২৪] বাগভট দারুহরিদ্রাকে এর উপরে বাত, পিত্ত ও কফ নাশক বলেছেন। চক্ষুরোগে উপকারী, মেদ ও শিররোগে ফলপ্রদ বলেছেন।[২৫] চক্রপাণি রসাঞ্জনের একটি বিশেষ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন, প্রদর

রোগে।[২৬] শার্ঙ্গধর বলেছেন, দারুহরিদ্রাঘটিত তৈল সর্বজ্বর বিমোক্ষণ এবং উপদংশরোগে উপকারী।[২৭] যতদূর মনে হয়, এই দুই রোগে এঁর পূর্বে বৈদ্যেরা কখনও দারুহরিদ্রা ব্যবহার করেন নি। তিক্ত আস্বাদের জন্য ইউরোপে বার্বেরিসের ছাল আজও বলবর্ধক ও ক্ষুধা-উত্তেজক টনিকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২]

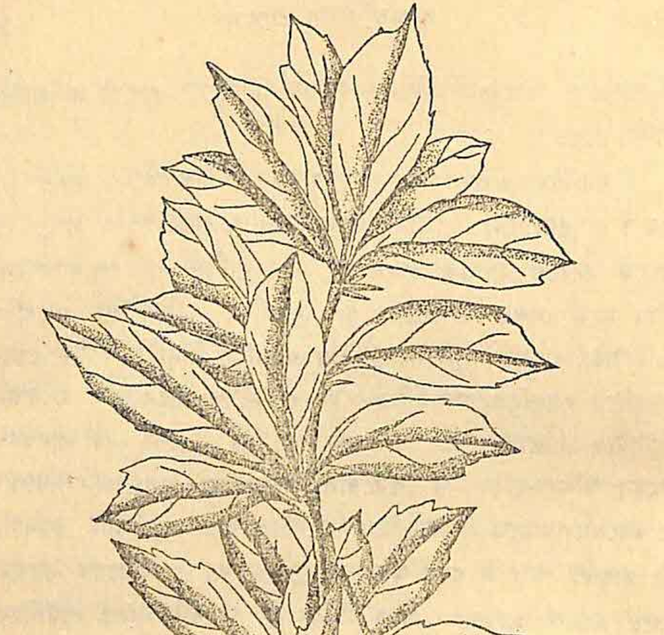
এঁদের অবশ্য অনেককাল পরে উনবিংশ শতাব্দীতে চক্ষুরোগে রসাঞ্জন অদ্বিতীয় ওষুধ বলে রয়েল উল্লেখ করে গেছেন![৮] পণ্ডিত বনমালী দত্তশর্মা মাস ছয় আগে তিব্বত ভ্রমণকালে লেখকের কাছ থেকে দেড় ছটাক আন্দাজ দারুহরিদ্রাজাত বার্বেরিন ক্লোরাইড চূর্ণ সঙ্গে নিয়ে যান, এবং সেখানে চক্ষুরোগে যদৃচ্ছা প্রয়োগে রোগ সারিয়েছেন বলেন। একে ওদেশে জলাভাব, বিশেষ করে শীতকালে, উপরন্তু শুদ্ধজল পাওয়া যায় না বললেই হয়। তাই তিনি বার্বেরিন ক্লোরাইড চূর্ণ চক্ষুতে সাবধানে স্বল্পপরিমাণে প্রয়োগ করতেন। এভাবে দুই-তিন বার প্রয়োগ করলেই চক্ষুর ফুলা বা চক্ষুর পাতার ক্ষত যত পুরাতনই হোক না কেন সম্পূর্ণ সেরে যেত। রয়েলের কয়েক বছর পরে ওসাগ্নেসি আধুনিক প্রণালীতে পরীক্ষা করে রসাঞ্জনকে জ্বরঘ্ন বলে প্রতিপন্ন করেন।[১৬] বার্বেরিন সলফেট প্রয়োগে ম্যালেরিয়ার পরজীবী রক্তকণিকার গভীরতর অংশ থেকে উপরিভাগে এসে পড়ে। বার্বেরিন সলফেট প্রয়োগের আগে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ম্যালেরিয়ার পরজীবী অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে না, অথচ বার্বেরিন সলফেট প্রয়োগের পর রক্তপরীক্ষা করাতে ম্যালেরিয়ার পরজীবী সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাই ইটালিয়ান ডাক্তার সেবাটিনি সুপ্ত ম্যালেরিয়া নির্ণয়ের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বার্বেরিন সলফেট ব্যবহার করতেন।[৮২] যখন গত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে কুইনিনের আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় পূর্বে

বার্বেরিন প্রয়োগে ম্যালেরিয়ার পরজীবীকে রক্তকণিকার উপরিভাগে এনে তার পর কুইনিন প্রয়োগ করলে রোগী প্রতি কুইনিনের পরিমাণ কম ব্যবহার করলেও চলতে পারে বলে ডাক্তার ব্রহ্মচারী বার্বেরিন ব্যবহার করেছিলেন।[৮৩] বার্বেরিন উপক্ষারকে ট্রিপানোসোম জাতীয় পরজীবীনাশক বলা হয়।[৮৪] এমনকি বার্বেরিনকে ব্যাকটেরিয়া-নাশকও বলা হয়েছে।[৮৫]

ব্রণ ও ক্ষতে দারুহরিদ্রা বিশেষ উপকারী বলে পার্কার পরীক্ষা করে দেখান।[১৬] জলি ১৯১১ সালে, 'ওরিয়েণ্টেল সোর্' নামক ক্ষত-বিশেষে বার্বেরিন উপক্ষার প্রয়োগ করেন।[২৮] পরবর্তী কালে বার্বেরিন উক্ত ক্ষতের অমোঘ ওষুধ বলে প্রমাণিত হয়। বিলাতের মে ও বেকার কোম্পানি 'ওরিয়েণ্টেল সোর্'এর জন্য বার্বেরিনঘটিত ওষুধ 'ওরিসল' প্রস্তুত করেন। ১৯৪০ সালে বার্বেরিস আম্বেলাটা নামে হিমালয়জাত এক দারুহরিদ্রা থেকে বর্তমান লেখক আম্বেলাটিন নামক এক উপক্ষার আবিষ্কার করেন।[১৭] এটিও 'ওরিয়েণ্টেল সোর্' ক্ষতে আশু ফলপ্রদ, বোধ হয় বার্বেরিনের চাইতে অধিক ফলপ্রদ বলে পরিচিত হয়েছে।[১৯] গত যুদ্ধের সময় যখন 'ওরিসল' বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন আম্বেলাটিন উপক্ষার থেকে তৈরি ওষুধ উক্ত ক্ষতাক্রান্ত অনেকগুলি রোগীকে নিরাময় করেছিল এবং সুখের বিষয় যে 'ওরিসলে'র সমান ফলপ্রদ হয়েছিল। ১৯১২ সালে ফ্রয়েণ্ড বার্বেরিন অণুকে খণ্ডিত করে হাইড্রাস্টিনিন নামক বিশেষ উপকারী রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন[২৯]। এটি রক্তস্রাব বন্ধ করতে অদ্বিতীয়। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত Indian Pharmacopoeial List বা ভারতীয় ভেষজ সংগ্রহ তালিকায় দারুহরিদ্রার ও দারুহরিদ্রাজাত উপক্ষার বার্বেরিনের স্থান হয়েছে এবং তাতে দারুহরিদ্রা থেকে বার্বেরিন

নিষ্কাশন ও ভেষজে বার্বেরিনের পরিমাণ নির্ধারণের প্রণালী সবিস্তারিত বর্ণিত আছে।

উত্তর-হিমালয় ভ্রমণকালে রয়েল রসাঞ্জন যে গাছ থেকে প্রস্তুত করা হয় তার সন্ধান পান। তিনিই প্রথম বলেন যে দারুহরিদ্রার গাছ, যার থেকে এদেশে রসাঞ্জন তৈরি হয় তার লাতিন নাম হল বার্বেরিস। তাঁর মতে দেশজ দারুহরিদ্রা হল বার্বেরিস এশিয়াটিকা, বার্বেরিস এরিস্টাটা, বার্বেরিস লাইসিয়ম, কিম্বা বার্বেরিস পিনাটা। ঠিক কোন্ গাছটিকে দারুহরিদ্রা বলা উচিত রয়েল তা নির্দেশ করেন নি।[৯] বার্বেরিস পিনাটার নামগোত্র পরে পরিবর্তন করা হয়। এটির নব নামকরণ করেন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ দ্য কন্‌ডোল, মাহোনিয়া নেপালেনসিস বলে। দ্য কন্‌ডোলের মতে ঐ গাছটিকে বার্বেরিস বলা চলে না। কেননা, ঐ গাছটির আকৃতি কাণ্ড ত্বক পত্র পুষ্প সকলই বার্বেরিসের গাছের চেয়ে অনেক তফাত। গ্রীক চিকিৎসক ডায়স্করিডিস্‌এর লাইসিয়ম আমাদের দেশের রসাঞ্জন বলে রয়েল মনে করেন। প্রথম শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে গ্রীক নাবিকেরা বাণিজ্য করতে আসতেন। শফ্[৪] এইরূপ বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহকালে এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া রসাঞ্জনকে গ্রীক ভেষজ লাইসিয়ম বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করা ভেষজের উপর রোমদেশে শুল্ক ধার্য করা হত। রসাঞ্জনের উপরও শুল্ক ধরা ছিল। রসাঞ্জন রাখবার জন্য যেসব পাত্র ব্যবহার করা হত, তা নাকি হার্কুলেনেলিয়ম ও পম্পেআই সহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা গেছে। ঐতিহাসিক প্লিনি রসাঞ্জন তৈরি করার যে প্রণালী বর্ণনা করেছেন, তা আয়ুর্বেদ-বর্ণিত প্রণালীর অনুবাদ বললেও অত্যুক্তি হবে না।[৩০] প্লিনি লিখেছেন, 'অত্যন্ত তিক্ত শিকড় বা কাণ্ড প্রথমে চূর্ণ করে নিয়ে জল দিয়ে তামার পাত্রে তিন দিন



বার্বেরিস এশিয়াটিকা

রক্‌সবরা অঙ্কিত চিত্র থেকে

সিদ্ধ করে নেবার পর জলীয় অংশ শিকড় বা কাণ্ডের চূর্ণ অংশ থেকে ছেঁকে নেওয়া হয়। তার পর জলীয় অংশকে জ্বাল দিয়ে নেড়ে নেড়ে মধুর মত ঘন করলে রসাঞ্জন তৈরি হয়।' আয়ুর্বেদে উল্লিখিত আছে যে দারুহরিদ্রার শুষ্ক শিকড়ের ছাল (এক ভাগ) জল (আট ভাগ) দিয়ে সিদ্ধ করে জলীয় অংশের ওজন চার ভাগের এক ভাগ করে নিয়ে ঘনীভূত জলীয় অংশ ছেঁকে নিতে হবে। পরে সমভাগ দুধ দিয়ে সিদ্ধ করে আফিমের মত ঘন করে নিলে রসাঞ্জন প্রস্তুত হবে—

"দার্বীক্বাথ সমংক্ষীরং পাদং পক্ত্বা যদাঘনম্। তদারসাঞ্জনাখ্যন্তং।"

—ভাবপ্রকাশ, পূর্বখণ্ড, প্রথম ভাগ

তখনকার দিনে রসাঞ্জন বা অন্যান্য ভেষজের ব্যবহার ভারতবর্ষ থেকে অন্য দেশে প্রচলিত হয়েছিল বলে নির্ধারিত হয়েছে। গ্রীকদের চিকিৎসাশাস্ত্রের আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল বোগদাদে। পারস্যবাসীরা তাঁদের ভাষায় পরে তার থেকে অনুবাদ করে নিয়েছিলেন। এইভাবে আমাদের দেশের আয়ুর্বিজ্ঞান ইউরোপে প্রচলিত হয়ে যায়। ইউরোপীয় বার্বেরিস নামটির উৎপত্তি বোধ করি দারুহরিদ্রার আরবি নাম আম্‌বার্বেরি থেকে। আমবার্বেরির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল হলুদ রঙের কাঠ। দারুহরিদ্রা বলতেও আমরা বুঝি হরিদ্রা বা হলুদ রঙের দারু বা কাষ্ঠ। পারশি ভাষায় দারুহরিদ্রাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, যেমন জ়রিষ্ক জ়রুজ জ়ুরঞ্জ ও জ়ুরক। এই কথাগুলি দারুহরিদ্রার সোনালি রংকে ইঙ্গিত করে। এবং মনে হয় পারস্যভাষায় জ়ুর বা সোনার নাম থেকে ঐ শব্দগুলি গড়ে নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষাতে দারুহরিদ্রার আর-এক নাম সৌবর্ণি। এই কথাটির উৎপত্তি অবশ্যই সুবর্ণ বা সোনা থেকে।[৩১]

ভরসা করি, বার্বেরিস গাছের প্রথম নামকরণ যে ভারতবর্ষ থেকে

হয়, বললে ভুল হবে না। দারুহরিদ্রার গাছগুলির আকার অনেকটা ঝোপের মত, বড় বনস্পতির আকার নয়। কোনো কোনো জাতের দারু-হরিদ্রা সাত ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর কাণ্ড প্রায় ছয় ইঞ্চি মোটা হয়। এর বিশিষ্ট হলুদ রং জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। তিব্বতীরা মাখন জ্বালিয়ে ঘি তৈরি করার সময় দারুহরিদ্রার লাঠি দিয়ে তরল ঘি নাড়তে থাকে, যাতে ঘিয়ের রং বেশ সোনালি হয়। ওয়াট[১৬] বলেছেন, এদেশে চামড়া ট্যান করতে দারুহরিদ্রাজাত হলুদ রং ব্যবহার করা হত। পশমি কাপড়ে এই রঙের ছাপ লাগলে আর সহজে উঠে না। অনেকের বিশ্বাস, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই স্বর্ণাভ পীত রঙে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করতেন। ভারতীয় চিকিৎসকেরা হলুদের যতগুলি নাম, রজনী নিশা ইত্যাদি সব কয়টিই দারুহরিদ্রার প্রতি আরোপ করেছেন। তাই দেখি, দারুহরিদ্রাকে অভিহিত করা হয়েছে পীতদারু বা পীতদ্রু বলে, দারুনিশা দারুরজনী বলে। সংস্কৃত ভাষায় দারুহরিদ্রার আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, যেমন কালেয়ক ও দার্বী।

আজকালকার উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব মতে বার্বেরিস তো বহুপ্রকারের। সারা পৃথিবীতে প্রায় ছয় শত জাতির বার্বেরিস আছে, আমাদের দেশেও আছে সত্তর রকমের। এর মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্ কোন্‌টি আয়ুর্বেদোক্ত দারুহরিদ্রা? এর সঠিক নিষ্পত্তি এখনও হয় নি। তবে খানিকটা সম্ভাব্য অনুমান করা যায়। আয়ুর্বিজ্ঞান গড়ে ওঠে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যুক্তপ্রদেশে। সুশ্রুত কাশীরাজ দিবদাস ধন্বন্তরীর কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। আবার অগ্নিবেশ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বসু আত্রেয়র কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পরে ভেষজবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চরকসংহিতার অনেক উপাদান উক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।[৩২] তাই মনে হয় যে, ঐসব অঞ্চলে বার্বেরিসের যে জাতটি

বেশি পরিমাণে জন্মায় সেইটি হয়তো দারুহরিদ্রা বলে প্রচলিত হয়েছে। কেননা, এটা অনুমান করা খুব অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, দিবদাস সুশ্রুত পুনর্বসু বা চরক দারুহরিদ্রার যেটি সহজলভ্য জাতি সেইটি ওষুধ তৈরি করার জন্যে সংগ্রহ করতেন। বার্বেরিস এশিয়াটিকা নামক দারুহরিদ্রাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। তাই দারুহরিদ্রা বলতে বার্বেরিস এশিয়াটিকা বেশি করে বুঝায় বলা যেতে পারে। অবশ্য ভেষজ হিসাবে অন্যান্য বার্বেরিস জাতিও ফলপ্রদ। কলিকাতার বাজারে দারুহরিদ্রা বলে যে কাষ্ঠখণ্ডগুলি বিক্রি হয়, সেগুলি তো মনে হয় বার্বেরিস জাতির কাষ্ঠখণ্ড নয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মনে হয় যে সেগুলি কোনো-এক জাতির মাহোনিয়ার। কেননা ভারতীয় মাহোনিয়ার বিভিন্ন জাতি থেকে নেপরোটিন নামে একটি লাল রঙের উপক্ষার পাওয়া যায়; এটি ভারতীয় বার্বেরিসে পাওয়া যায় না। এই কাষ্ঠখণ্ডগুলি থেকে নেপরোটিন নিষ্কাশন করা গেছে। বার্বেরিসের ও মাহোনিয়ার মত আরও কয়েকটি গাছ বার্বেরিসের মতই ভেষজগুণসম্পন্ন, যেমন আসামের কপটিস (Coptis), উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের থ্যালিকট্রাম (Thalictrum) ইত্যাদি।

বার্বেরিসের জাতি

এখন থেকে আমরা দারুহরিদ্রার গোত্রজাত বার্বেরিস নাম ব্যবহার করব। বার্বেরিস এশিয়াটিকা ও বার্বেরিস এরিস্টাটা নামে দুই জাতের বার্বেরিস এদেশে সবচেয়ে আগে আবিষ্কার করা হয় ১৮২১ সালে।[৩৩] তার পর সন্ধান মেলে বার্বেরিস টিঙ্ক্টোরিয়ার।[৩৪] ক্রমশ নব নব বার্বেরিস আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য গেল; আবিষ্কার হল ১৮২৩ সালে বার্বেরিস চিত্রিয়া[৩৫] ও পরের বছরে বার্বেরিস ওয়ালিচিয়ানার।[৩৬]

আবার ১৮৩১ সালের পর থেকে আরও পাঁচটি নূতন জাতের বার্বেরিস পাওয়া গেল।[৩৭] এদের নাম পরিশিষ্টে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মধ্যে মিশালে একটি-দুইটি করে বার্বেরিস আবিষ্কার হওয়ার ফলে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল।[৩৮] ১৮৫৫ সালে পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল থেকে হুকার নিয়ে এলেন আরও চারটিকে।[৩৯] তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ফ্লোরা অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া'তে সবশুদ্ধ বারো জাতের বার্বেরিসের বর্ণনা করেছেন।[৪০] ১৮৫৫ সালের পরে যদিও মাঝেমাঝে নূতন জাতের বার্বেরিসের বর্ণনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তবু সংখ্যা তত আশাপ্রদ হয় নি।[৪১] এর পরের পঞ্চাশ বছরে মাত্র পাঁচটি, যথা, হুকেরাই[৪১] কেলিওবটরিস[৪২] অর্থোবটরিস[৪২] ভিরেসেন্স[৪৩] ও পাচিয়াকান্থা[৪৪] আবিষ্কার হয়েছে।

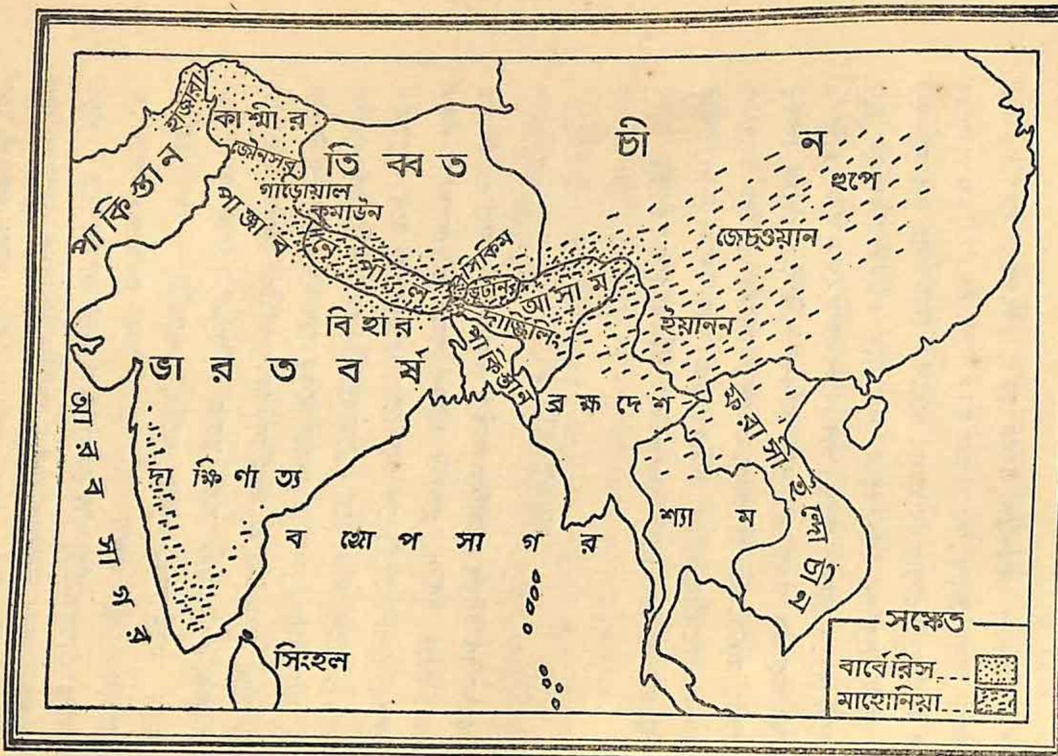
জার্মানি থেকে চার বছর, ১৯০৫-০৮, পরিশ্রম করে স্নাইডের বার্বেরিসের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রকাশ করেন।[৪৫] তিনি আরও তেরোটি নূতন জাতের বার্বেরিস ভারতবর্ষের পার্বত্য প্রদেশে জন্মায় বলেন। ১৯১২ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বার্বেরিস জাতি বড়-একটা আবিষ্কার হয় নি।[৪৬] ১৯৩৩-৩৪, আবার ১৯৩৬-৩৭ সালে লাডলো ও শেরিফ নামে দুইজন বিজ্ঞানী তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে গাছপালা সংগ্রহের অভিযান করেন। ১৯৩৫-৩৮ সালে আসাম অঞ্চলে ভ্রমণ করেন কিংডন-ওয়ার্ড। এঁদের সংগৃহীত গাছপালা থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক আহ্‌রেণ্ডট্ আরও কতকগুলি নূতন জাতের বার্বেরিস আবিষ্কার করেন।[৪৭]

ভারতবর্ষের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের বার্বেরিস প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সাধারণত দেখা যায় হিমালয়ের পূর্বপ্রদেশে যেসব জাতের বার্বেরিস জন্মায়, সেগুলি চিরশ্যামল অর্থাৎ বারোমাসই সেসব গাছে সবুজ পাতা থাকে। আর পশ্চিমপ্রদেশের বার্বেরিসগুলির পাতা শীতকালে

ঝরে যায়, আবার বসন্তকালে উদ্গত হয়। ইউরোপে বার্বেরিস গাছ বাগানে বেড়া দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বেশ ঘন কাঁটাযুক্ত ঝোপ হয় বলে বার্বেরিসের বেড়ার খুব প্রচলন ওদেশে। বার্বেরিসের ফুল আকারে খুব ছোট, খুব ঘন হলুদ রঙের; এক সঙ্গে থোকা-থোকা ফুল ফুটে থাকলে দেখতে ভালোই লাগে। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ জায়গায় কি কি জাতের বার্বেরিস পাওয়া যায় তার তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল; পরপৃষ্ঠায় মানচিত্রেও তা দেখানো হল। স্থানের বিভিন্ন উচ্চতা ও সেখানকার বার্বেরিস জাতির তালিকা এবং কবে কোন্ সালে কোন্ বার্বেরিসটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তারও এক তালিকা দেওয়া গেল।

মাহোনিয়ার জাতি

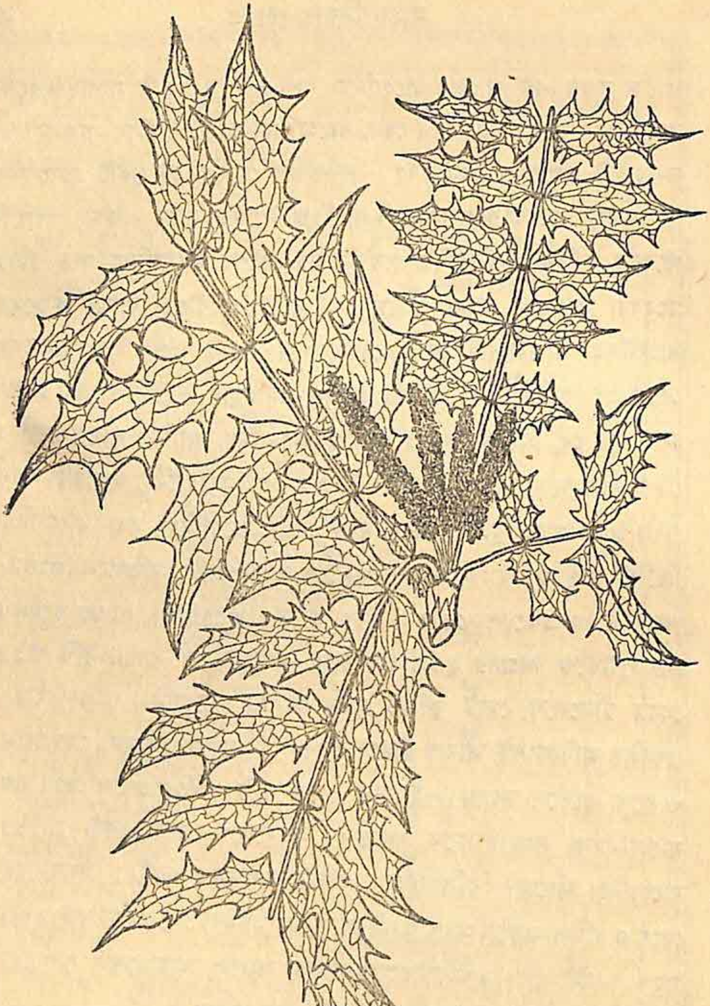
ভেষজগুণ হিসাবে মাহোনিয়া জাতীয় গাছগুলিকে আমরা বার্বেরিসের অনুরূপ বলতে পারি। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা মাহোনিয়াকে বার্বেরিসের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করতেন। পরে ১৯০১ সালে ফেডি মাহোনিয়াকে বার্বেরিস থেকে উদ্ভিদতত্ত্বগত দিক থেকে পৃথক করেন।[৪৮] এর অবশ্য অনেক বছর আগে হুকার ও টম্‌সন নেপালজাত মাহোনিয়াকে বার্বেরিস নেপালেনসিস বলেই অভিহিত করেছিলেন।[৪০] ১৮৬২ সালে হুকার ও টম্‌সন দক্ষিণভারত থেকে সংগৃহীত মাহোনিয়ার নাম করেন, মাহোনিয়া নেপালেনসিস ড্যকন্‌ডোল। ওঁরা প্রথমে মনে করেছিলেন ড্যকন্‌ডোল অভিহিত মাহোনিয়া নেপালেনসিস ও উক্ত মাহোনিয়া একই জাতের গাছ। পরে ওঁরা লক্ষ্য করেন যে ড্যকন্‌ডোলের নামাঙ্কিত মাহোনিয়া নেপালেনসিস থেকে তার সামান্য কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু পার্থক্য এত কম যে



ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশজাত বার্বেরিস ও মাহোনিয়া

তাকে নূতন এক জাতের মাহোনিয়া বলা চলে না, তাই সংগ্রহকারকের নাম উল্লেখ করে সেটির নাম দেন, মাহোনিয়া নেপালেনসিস হুকন্‌ডোল, ভ্যারাইটি লেসেনল্‌টিআই।[৪০] ভারতবর্ষে কেবল এই দুইটি মাহোনিয়া আছে বলে এতাবৎকাল জানা ছিল, কিন্তু টাকেডা নামে একজন জাপানি গবেষক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশের মাহোনিয়া গাছ নিয়ে গবেষণা করাতে জানা গেছে যে সারা পৃথিবীতে বাষট্টি রকমের মাহোনিয়া পাওয়া যায়, তার মধ্যে মাত্র এগারোটি পাওয়া যায় আমাদের দেশে।[৪১] পরিশিষ্টে গাছগুলির নাম ও প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি দেওয়া গেল। দেখা যায় যে, হিমালয়ের পূর্ব অঞ্চলে মাহোনিয়া জাতির সংখ্যা বেশি। কেবলমাত্র আসামেই এগারোটির ভিতর পাঁচটি মাহোনিয়া জন্মায়। এখন পর্যন্ত জানা আছে ভুটান অঞ্চলে মাত্র একটি মাহোনিয়া, যথা মাহোনিয়া গ্রিফিথিআই জন্মায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভার্নে-কাটিং অভিযানে কিংডন-ওয়ার্ড উত্তর-ব্রহ্মদেশ থেকে বিবিধ জাতির মাহোনিয়া সংগ্রহ করেন। যত পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই মাহোনিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন চীনদেশে মোট কুড়িটি নূতন জাতির মাহোনিয়া পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশই আবার চীনদেশেরও পূর্ব অঞ্চলে ইয়ানন, জেচওয়ান ও হুপে প্রদেশে জন্মায়। ইয়ানন থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে দেখা যায় মাহোনিয়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শ্যামদেশে মাত্র একটি জাতির মাহোনিয়া আছে; ফিলিপাইনেও একটি, জাপানেও একটি। আমাদের দেশেও দক্ষিণ অঞ্চলে মাত্র একটি জাতি, মাহোনিয়া লেসেনল্‌টিআই দেখা যায়। এটিই সারা দক্ষিণভারতের পার্বত্য অঞ্চলে, আন্নামালাই পাহাড়ে, টিনেভেলি পাহাড়ে, বিশেষ করে নীলগিরিতে জন্মায়।

সারা এশিয়া ও আমেরিকা ভূখণ্ডে বাষট্টি রকম মাহোনিয়া জন্মায়, তার মধ্যে চীনদেশে তেইশটি পাওয়া যায়, আর এগারটি আমাদের



মাহোনিয়া একান্থিফোলিয়া

দারজিলিঙে প্রাপ্ত গাছ থেকে অঙ্কিত

দেশে। বাকি আঠাশটি নানান দেশে ছড়িয়ে আছে। চীনদেশের মধ্যে আবার ইয়ানন প্রদেশেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা মাহোনিয়া দেখা যায়। তাই মনে হয়, মাহোনিয়ার আদিম জন্মস্থান হয়তো ইয়ানন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মাহোনিয়া আসামের দিকে এসে পড়েছে ও পরে আরও পশ্চিম দিকে সিকিম ও নেপালে অগ্রসর হয়ে এসেছে।

দারুহরিদ্রার রাসায়নিক পরীক্ষা

দারুহরিদ্রা বা বিভিন্ন জাতির বার্বেরিস ও মাহোনিয়া থেকে এক বা একই ধরনের বিবিধ উপক্ষার রাসায়নিক উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়েছে। বার্বেরিস জাতির রাসায়নিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে ১৮৩৭ সালে। বুকনার[৫০] ইউরোপীয় বার্বেরিস ভুলগারিস থেকে বার্বেরিন নামক বিখ্যাত উপক্ষার সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। অবশ্য উপক্ষারটির অণুর গঠন সম্বন্ধে কোনো কথা তখন বলা যায় নি। পার্কিন[৫১] ১৮৮৯ সালে বার্বেরিনের অণুর গঠন সম্বন্ধে সবিস্তারিত পরীক্ষা করেন এবং তিনি যে অণুর গঠনসংকেত সাধারণ্যে প্রচার করেন, তা উত্তরকালে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরে উনি বার্বেরিন উপক্ষার পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ করেন।[৫২]

১৮৬১ সালে ওয়েকার[৫৩] বার্বেরিস ভুলগারিস থেকে অক্সিআকান্থিন নামে আর-একটি নূতন উপক্ষার আবিষ্কার করেন। হেস[৫৪] পরে ঐ গাছটির পুনরায় রাসায়নিক পরীক্ষা করে আর-একটি উপক্ষার আবিষ্কার করেন ও তার নাম দেন বার্বেমিন। শুধু তাই নয়, তিনি বার্বেমিন ও অক্সিআকান্থিন উপক্ষার দুইটির অণুর সংকেত একই, $C_{18}H_{19}O_3N$ হবে বলেন, কিন্তু রুয়েডেল[৫৫] পরে সে দুটি পরিবর্তন

করেন; ভাগ্যবশে রুয়েডেলের পরিবর্তিত সংকেতও ঠিক বলে প্রমাণিত হয় নি, এবং বার্বেমিনের সংকেত স্পেথ ও কলবে সংশোধন করে $C_{37}H_{40}O_6N$এ দাঁড় করান, ওদিকে স্যান্টোস অক্সিআকান্থিনের সংকেতকেও $C_{37}H_{40}O_6N$এ পরিবর্তিত করেন। দেখা যাচ্ছে যে দুটি উপক্ষারেরই অণুর সংকেত এক, অথচ অন্যান্য রাসায়নিক গুণের পার্থক্য থাকায় উপক্ষার দুটিকে ভিন্ন বলা হয়। তাহলে উপক্ষার দুটির অণুর গঠনে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে বলে অনুমান হয় এবং পরে পরীক্ষাগারে তার রাসায়নিক প্রমাণ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়।[৫৬] এর পর ১৯২৯ সালে স্পেথ ও পলগার[৫৭] বার্বেরিস ভুলগারিস গাছের শিকড়ের বল্কল থেকে বার্বেরিন, বার্বেমিন ও অক্সিআকান্থিন ছাড়াও আরও পাঁচটি উপক্ষার, পালমাটিন, $C_{21}H_{23}O_5N$, ইআট্রিহিজিন, $C_{20}H_{21}O_5N$, কলাম্বামিন, $C_{20}H_{21}O_5N$, বার্বেরুবিন, $C_{19}H_{15}O_4N$, এবং আর-একটি উপক্ষার (যার কোনো নাম স্পেথ দেন নি, কেবল তার অণুর সংকেত বলেছিলেন, $C_{19}H_{22}ON_2$) আবিষ্কার করেন।

১৮৭৮ সালে নেপাক আমেরিকাজাত বার্বেরিস নার্ভোসা থেকে বার্বেরিন উপক্ষার পান।[৫৮] পার্সনস্ ১৮৮২ সালে আমেরিকাজাত মাহোনিয়া একুইফোলিয়ম থেকে অক্সিআকান্থিন ও বার্বেরিন উপক্ষার আবিষ্কার করেন।[৫৯] এর পর থেকে মনে হয় বার্বেরিস গাছের দিকে গবেষকদের নজর পড়ে; ১৮৮৬ সালে শিলবাক[৬০] বার্বেরিস গ্লাউকা থেকে বার্বেরিন পেলেন, ১৮৯১ সালে রুয়েডেল[৫৫] মাহোনিয়া একুইফোলিয়ম থেকে অক্সিআকান্থিন ও বার্বেমিন উপক্ষার নিষ্কাশন করেন এবং এর পরের বছর এরাটা[৬১] বার্বেরিস বুকসিফোলিআ থেকে কেবলমাত্র বার্বেরিন উপক্ষার আবিষ্কার করেন, পার্কিন বার্বেরিস ইটনেনসিসে বার্বেরিনের অবস্থিতি প্রমাণ করেন।

আমাদের দেশে দারুহরিদ্রার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হয় ১৯২৯ সালে। স্কুল অব্ ট্রপিকেল মেডিসিনে বার্বেরিস এশিয়াটিকা থেকে অক্‌সিআকান্থিন ও বার্বেরিন আবিষ্কৃত হয়।[৬২] পরে ঐ প্রতিষ্ঠানে বার্বেরিনের ভেষজ গুণ সবিস্তারিত পরীক্ষা হয়। এর পরে দেখি জাপানে ঐ দেশজাত দারুহরিদ্রা নিয়ে রাসায়নিক গবেষণা শুরু হয়।[৬৩] ১৯৩২ সালে ফিলিপাইন দ্বীপে মাহোনিয়া ফিলিপিনেনসিস গাছের পরীক্ষা করা হয় ও বার্বেরিন, পালমাটিন ও ইআট্রর্হিজিন উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়।[৬৪] ওরেকফ ১৯৩৩ সালে রাশিয়াজাত বার্বেরিস হেটারোপোডা থেকে অনেকগুলি উপক্ষার পান।[৬৫] এর সবগুলি পূর্বে স্পেথ ও পলগার বার্বেরিস ভুলগারিস থেকে নিষ্কাশন করেন। আমেরিকাজাত আর-একটি দারুহরিদ্রা বার্বেরিস ডারুইনাই নিয়ে ইংলণ্ডে কাজ করেন ক্রমওয়েল[৬৬], ও পূর্ববর্তী অধিকাংশ গবেষকদের মত কেবল বার্বেরিনের পরিচয় পান। ক্লাইন[৬৭] বিভিন্ন দেশজাত দারুহরিদ্রাতে বার্বেরিনের অবস্থিতি প্রমাণ করেন, যেমন ক্যানাডার বার্বেরিস ক্যানাডেনসিস, ক্রীটের বার্বেরিস ক্রীটিকা, ভারতবর্ষের বার্বেরিস লাইসিয়ম ইত্যাদি। ব্রাজিলজাত বার্বেরিস লরিনা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে হাইড্রাস্টিন ও বার্বেরিন।[৬৮] ইতিপূর্বে আর কোনো জাতির বার্বেরিস থেকে হাইড্রাস্টিন উপক্ষার পাওয়া যায় নি। অবশ্য হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেনসিস গাছ থেকে হাইড্রাস্টিন ও বার্বেরিন উপক্ষার এর অনেক আগেই নিষ্কাশিত হয়েছিল।[৬৯] আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলে জন্মায় মাহোনিয়া সোয়াসিয়াই আর মাহোনিয়া ট্রাইফোলিওলাটা। এই দুটি গাছ থেকে বেশ বেশি পরিমাণে (প্রায় শতকরা দুই ভাগ) বার্বেরিন পাওয়া গেছে।[৭০] এর পরে বার্বেরিন রেপেন্স থেকেও কেবল বার্বেরিন পাওয়া গেছে।[৭১] বর্তমান লেখক

হিমালয়জাত বিভিন্ন দারুহরিদ্রা থেকে বিবিধ উপক্ষার আবিষ্কার করেছেন।[১৪,১৭,১৮,৭২] বিবিধ বার্বেরিস ও মাহোনিয়া গাছ থেকে যেসকল উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়েছে তার পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। ১৯৫০ সালে সিদ্দিকি বার্বেরিস এরিস্টাটাতে বার্বেরিন ও পালমাটিন আছে বলে প্রমাণ করেছেন।[৭৩] বিবিধ দারুহরিদ্রাজাত বার্বেরিন উপক্ষারের অণুর গঠনের ছবি দেওয়া গেল।

উপক্ষারগুলি গাছ থেকে কি ভাবে পরীক্ষাগারে আহরণ করা হয় তার সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বলা বাহুল্য উপক্ষারগুলির পৃথকীকরণ-পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, সূক্ষ্ম ও শ্রমসাধ্য। অতি সাবধানে বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি করতে না পারলে প্রতিপদে বিফলতা অর্জন করার সম্ভাবনা। দারুহরিদ্রার যে অংশ থেকে উপক্ষারগুলি আহরণ করতে হবে, সেই অংশ রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হয়। দারুহরিদ্রার শিকড়ের ছালে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ উপক্ষার থাকে। তবে শিকড়ের ছালও বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করা শক্ত। কেননা, গাছের যে-কোনো অংশে শতকরা প্রায় ষাট ভাগ জল থাকে। অর্থাৎ দশ সের তাজা গাছের শিকড় যদি রৌদ্রে শুকানো হয় তো শুষ্ক শিকড়ের ওজন হবে মাত্র চার সের ; ছয় সের জল শিকড় শুকাবার সময় উবে যায়। আবার সেই চার সের শুষ্ক শিকড় থেকে চেঁছে নেওয়া ছালের পরিমাণ অবশ্যই আরও অনেক কম, মাত্র অর্ধ পোয়া। অথচ দশ সের শিকড় সংগ্রহ অর্থে হল অন্তত চার-পাঁচটি দারুহরিদ্রার ঝোপকে সমূলে উৎপাটিত করা। আর তার উপর দারুহরিদ্রার শাখাগুলি কাঁটাভর্তি, উপরন্তু দারুহরিদ্রা জন্মায় দুর্গম বনপ্রদেশে, সুতরাং দশ সের শিকড় সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। তাই গবেষকদের শিকড়ের ছালের পরিবর্তে কেবলমাত্র শুষ্ক শিকড় পেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

তবে শিকড়ে গাছের ছাল বা গাছের ডাঁটার চাইতে উপক্ষারের পরিমাণ বেশি। শিকড়গুলি ছোট ছোট টুকরা করে হামানদিস্তর সাহায্যে চূর্ণ করে চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। শিকড়চূর্ণ ইথাইল কোহল বা সুরাসার দিয়ে সিদ্ধ করে, সুরাসার দ্রব ছেঁকে নিতে হয়। ও পরে সুরাসারে দ্রব ধীরে ধীরে গরম করলে কোহল বাষ্প হয়ে উবে যায়, আর দারুহরিদ্রা সত্ব চটচটে চিটেগুড়ের মত অবস্থায় পড়ে থাকে। এটিকে জল ও অ্যামোনিয়া দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে ইথর নামে তরল পদার্থ দিয়ে বার বার ঘুঁটে নিলে অক্সিআকান্থিন ও বার্বেমিন উপক্ষার দুটি ইথরে দ্রবিত হয়ে যায়। ইথর জলে মেশে না। তাই জল থেকে ইথর অংশ সহজেই পৃথক করে নেওয়া যায়। যেমন করে কেরোসিন তেল জল থেকে পৃথক করা যায়। এখন তা হলে বার্বেরিন ও অন্যান্য উপক্ষারগুলি জলীয় অংশে আছে বলা যেতে পারে। ঐ জলীয় অংশে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে পরে বার্বেরিনক্লোরাইড তৈরি হয়। বার্বেরিনক্লোরাইড জলে দ্রবিত থাকে না, পীত রঙের কেলাসিত কঠিন পদার্থরূপে জল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। তখন বার্বেরিনক্লোরাইড পরিস্রুত করে নিলেই চলে। পালমাটিন, ইআট্রইজিন জাতীয় উপক্ষারগুলি জলীয় অংশে এখনও দ্রবিত হয়ে থাকে। এগুলি পৃথক করা আরও কঠিন। ঐ জলীয় অংশে খানিক সোডিয়ম এসিটেট ও পটাসিয়ম আইওডাইড দেওয়া হয়। তাতে পালমাটিন ইত্যাদি সব উপক্ষারগুলি আইওডাইডে পরিণত হয়ে কেলাসিত অবস্থায় জল থেকে পৃথক হয়ে আসে। অবস্থাটা অনেকটা দুধে অ্যাসিড দিলে ছানা কেটে যাওয়ার মত। আইওডাইডটা ছেঁকে নিয়ে সিলভার ক্লোরাইড আর জল দিয়ে বারো ঘণ্টা ধরে সিদ্ধ করতে হয়। তার পর ছেঁকে নিয়ে জলীয় অংশটাতে দস্তা আর অ্যাসেটিক অ্যাসিড দিয়ে আবার উত্তপ্ত করতে হয়। তখন দেখা যায়,

৩

জলীয় অংশের ব্রাউন রং ধীরে ধীরে ফিকে হলদে হয়ে আসছে। ঐ ফিকে হলদে জলীয় অংশে অ্যামোনিয়া ও ইথর দিয়ে ঘুঁটলে ইথরীয় অংশে পালমাটিন, ইআট্রইহিজিন প্রভৃতি উপক্ষার দ্রবিত হয়ে আসে, পরে ইথর ধীরে ধীরে উবিয়ে বিবিধ রাসায়নিক উপায়ে পালমাটিন প্রভৃতি উপক্ষারগুলিকে পৃথক করে নেওয়া হয়।

গাছপালা ও উপক্ষারের প্রকারভেদ

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছপালা থেকে উপক্ষার পাওয়া যায়। ম্যাকনেয়ার[৭৪] এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, উক্ত দুই অঞ্চলে উদ্ভূত একান্নটি বিভিন্ন বর্গের গাছপালায় বিবিধ উপক্ষার জন্মে থাকে। শুধু তাই নয়, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের গাছ-পালা থেকে পাওয়া উপক্ষারগুলির অণুর ভার অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ দেশের গাছপালা থেকে আহরণ করা উপক্ষারগুলির অণুর ভার বেশি। এমনকি ঐসব উপক্ষারগুলিতে বর্তমান অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যাও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছে-পাওয়া উপক্ষারে বেশি। আরও বলা যায়, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উপক্ষারের অণুর 'আইসোকুইনোলিন' কাঠামো; গ্রীষ্ম অঞ্চলের 'কুইনোলিন' কাঠামো। বর্গ হিসাবে যে-সকল গাছপালা যত বেশি উন্নত তা থেকে লভ্য উপক্ষারের অণুর গঠন তত বেশি জটিল। বার্বেরিস ও মাহোনিয়া থেকে পাওয়া উপক্ষারগুলির সম্বন্ধেও তাই দেখা যায়। গাছগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই জন্মায় এবং বিধিমত আইসোকুইনোলিন কাঠামোর উপক্ষারই তৈরি করে। পরিশিষ্টের তালিকায় দেখা যাবে প্রত্যেকটি উপক্ষারেরই অণুর ভার বেশ বেশি। এবং অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যাও বেশি।

উপক্ষারের উৎপত্তি

উপক্ষারগুলির স্বাদ তিক্ত। বল্কলে বা পত্রে উপক্ষার থাকলে সেসব গাছ গোরুবাছুরে খেতে চায় না। তাই উপক্ষারগুলিকে অনেক বিজ্ঞানী গাছপালার প্রকৃতিদত্ত রক্ষণের উপায় বলে মনে করেন।[৭৫] বর্তমান লেখক বিভিন্ন বার্বেরিস ও মাহোনিয়া গাছের উপর গবেষণার সময় অণুবীক্ষণের সাহায্যে গাছের পাতা ছাল শিকড় ও ডাঁটা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সব ক্ষেত্রেই বাহিরের দিকে অবস্থিত কোষগুলিতে উপক্ষার সঞ্চিত আছে।[৭৬] নবউন্মীলিত শিকড়গুলি বা প্রাচীন শিকড়গুলির একেবারে বাহিরের দিকের শুষ্ক কোষগুলিতে উপক্ষার বর্তমান আছে। ডাঁটা বল্কল পত্র ও নবকিশলয়গুলিরও বহিঃস্থ কোষে উপক্ষার আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে ধরা পড়েছে যে, উপক্ষারপূর্ণ অধিকাংশ কোষগুলি শুষ্ক ও মৃত। গাছের বৃদ্ধি ও বাঁচার জন্য তারা কোনো কাজে লাগে না। তাই মনে হয়, কোষগুলি যেমন মৃত ও গাছের পক্ষে কালে ত্যাজ্য, তেমনই তাতে বর্তমান উপক্ষারগুলিও গাছের বর্জনীয় পদার্থ, সঞ্চিত খাদ্য নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গাছের বাঁচা ও বৃদ্ধির জন্য আহৃত নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন আত্তীকরণের সময় জৈব জারণে প্রোটিনের বৃহৎ ও জটিল অণুটি বহুধা বিভক্ত হলে অনেকগুলি অংশ নাইট্রোজেনঘটিত ছোট ছোট অ্যামিনো অ্যাসিডের বা অ্যামিনের অণুতে পরিণত হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড বা অ্যামিনগুলি আবার আরও বিভক্ত হয়ে নাইট্রোজেনবর্জিত অ্যালডিহাইডের অণুতে পরিণত হয় ও গাছের বৃদ্ধির জন্য কোনো কাজে লাগে না বলে ধীরে ধীরে জীবন্ত কোষ থেকে মৃত বা শুষ্ক কোষে

সঞ্চিত হয়।[৭৫] প্রোটিন → অ্যামিনোঅ্যাসিড বা অ্যামিন → অ্যালডিহাইড। অ্যামিনোঅ্যাসিড বা অ্যামিন + অ্যালডিহাইড → উপক্ষার।

উপক্ষার-সঞ্চিত গাছ থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড বা অ্যামিন আহরণ করা গেছে। যেমন, টেট্রামিথাইল অ্যামিনো বিউটেন বা টেট্রামিথাইল পিউট্রেসিন নামক অ্যামিন পাওয়া গেছে হায়োসিয়ামিন উপক্ষারের সঙ্গে হায়োসিয়ামাস মিউটিকাস ও হায়োসিয়ামাস রেটিক্যুলাটা গাছ থেকে।[৭৭] এমনকি অ্যাট্রোপা বেলেডোনা গাছে হায়োসিয়ামিন উপক্ষার ও পিউট্রেসিন নামক অ্যামিনের সঙ্গে একটি এঞ্জাইম পাওয়া গেছে যেটি পিউট্রেসিন অণুকে বিভক্ত করে নাইট্রোজেনঘটিত অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেনবিবর্জিত অ্যালডিহাইডে পরিণত করতে পারে।[৭৮] আবার পরীক্ষাগারে অ্যামিন ও অ্যামিনো অ্যাসিডকে নাইট্রোজেনঘটিত অ্যামোনিয়া নামক যৌগিক পদার্থ বিযুক্ত করে অ্যালডিহাইডে পরিণত করা গেছে। তার উপর আরও যেটা বড় প্রমাণ সেটিও পাওয়া গেছে। প্রকৃতিতে যে ভাবে উপক্ষার সংশ্লেষিত হচ্ছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে, সেইভাবে পরীক্ষাগারে অ্যালডিহাইড, অ্যামিনোঅ্যাসিড বা অ্যামিন থেকে সহজে উপক্ষার অণু নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে সবপ্রথম হদিশ দেন অধ্যাপক রবিনসন।[৭৯] পরে শফ্ ও তাঁর সহকর্মীরা এবং আরও অনেকে অনেকগুলি উপক্ষার প্রকৃতির সম্ভাব্য পদ্ধতি অনুকরণ করে সংশ্লেষণ করেছেন।[৮০]

দারুহরিদ্রা বা বার্বেরিস ও মাহোনিয়ার ক্ষেত্রে উপক্ষারগুলি যে বর্জিত পদার্থ, খাদ্য নয়, তা সঠিক বুঝা গেছে। উপক্ষারগুলি যদি দারুহরিদ্রার পক্ষে সঞ্চিত খাদ্য হত তাহলে প্রতিবৎসর শীতকালে গাছগুলিতে উপক্ষারের পরিমাণ কমে যাবার সম্ভাবনা থাকত। এবং

গাছের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উপক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। অথচ বর্তমান লেখক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মাহোনিয়া নেপালেনসিসএ উপক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[৮১] এবং শীতকালেই বার্বেরিস ও মাহোনিয়া গাছে উপক্ষারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

প্রোটিন আত্তীকরণের সঙ্গেসঙ্গে যে দারুহরিদ্রার উপক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাও দেখা গেছে। যে সময় পত্রপুষ্পে গাছ সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেই সময়ে তার উপক্ষারের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আর-এক উপায়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উপক্ষারগুলি দারুহরিদ্রার দুঃখদিনের জন্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত খাদ্য নয়। দারুহরিদ্রার বা যে কোনো গাছের বৃদ্ধি ও জীবনের জন্য নাইট্রোজেন যৌগিকের একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যদি কোনো কৃত্রিম উপায়ে যেটুকু পরিমাণ নাইট্রোজেন যৌগিক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেইটুকু পরিমাণও হ্রাস করানো যায়, তা হলে বল্কল পত্র বা মূলস্থিত উপক্ষারে বর্তমান নাইট্রোজেনে টান পড়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য শোধন করা বালুকাতে দারুহরিদ্রার চারা কৃত্রিম উপায়ে জল ও নাইট্রোজেনবর্জিত সার খাইয়ে বাঁচানো হয়েছে এবং দেখা গেছে এসব ক্ষেত্রেও দারুহরিদ্রার চারাগুলি অত্যন্ত ক্ষুধা সত্ত্বেও উপক্ষারগুলি স্পর্শ করে নি। উপক্ষারের পরিমাণ পরীক্ষার আগে ও পরে সমানই রয়ে গেছে, কমে যায় নি।

একটি গাছের চারাকে যদি পূর্ণ অন্ধকারে অনেকদিন ধরে রেখে দেওয়া হয়, তা হলে চারাটির আর সবুজ রং হয় না, তার পরিবর্তে কেমন যেন পাণ্ডুর বর্ণ ও রুগ্ন ভাব হয়। সূর্যের আলোর সাহায্য ছাড়া গাছে সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হতে পারে না। আলোকের অভাবে তার বদলে পাণ্ডুর, ম্লান পীতাভ বর্ণের এটিওলিন জন্মায়। এই

রকম এটিওলিত চারা অন্ধকারে থাকলে অন্তঃস্থ সঞ্চিত খাদ্য ব্যয় করে তাকে বাঁচতে হয়। কেননা, আলোর প্রভাব ছাড়া গাছের খাদ্য প্রস্তুত ও পরিপাকের কাজ চলে না। আলোর অভাবে চারাটি তৃষিত হয়ে কেবল লম্বা হয়ে বাড়তে থাকে, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব সূর্যকিরণ স্পর্শ করতে পারে। এটিওলিত দারুহরিদ্রার চারা যত বড় হবার চেষ্টা করতে থাকে, তত দেখা যায় যে চারাগুলিতে উপক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই মনে হয়, যত প্রোটিন অণু ভেঙে যেতে থাকে, ততই গাছের স্বভাবগত রাসায়নিক উপায়ে উপক্ষারের অণু গড়ে উঠতে থাকে। দারুহরিদ্রার পক্ষে পিক্‌টের কথা সত্য যে উপক্ষারগুলি গাছের দুর্দিনের সঞ্চয় নয়, জীবজন্তুর মলমূত্রের মত ত্যাজ্য পদার্থ।[১৩]

পরিশিষ্ট

১. বিভিন্ন প্রদেশজাত বার্বেরিস

1. Hazara	...	*kunawarensis, Parkeriana.*
2. Kashmir	...	*Huegeliana, Jaeschkeana, kashmirana, orthobotrys, pseudo-umbellata, Royleana, ulicina, Zabeliana.*
3. Punjab-Himalaya		*Brandisiana, Edgeworthiana, glaucocarpa, kunawarensis, pachyacantha, pseudoumbellata.*
4. Garhwal	...	*asiatica, Osmastonii.*
5. Jaunsar	...	*Edgeworthiana, glaucocarpa, lycioides.*
6. Kumaon	...	*affinis, chitria, coriarea, Lambertii, Koehneana, kumaonensis, Usteriana.*
7. Nepal	...	*aristata, asiatica, ceratophylla, Duthieana, floribunda, Hamiltoniana, Lindleyana, umbellata, Wallichiana, Walteriana.*
8. Sikkim	...	*angulosa, concinna, Hookeri, insignis, macrosepala, paraviresсens, sikkimensis, Thomsoniana, virescens.*

9. Bhutan ... *asiatica, bhutanensis, ceratophylla, Cooperi, Griffithiana, himalaica, macrosepala, micrantha, praecipua, replicata* var. *dispar.*

10. Assam or near the border *chrysosphaera, dasyclada, erythroclada, Griffithiana, khasiana, manipurana, micropetala, sublevis, Wardii.*

11. Bihar ... *asiatica.*

12. South India ... *ceylanica, Hainesii, tinctoria, Wightiana.*

২. পার্বত্য প্রদেশের বিভিন্ন উচ্চতায় প্রাপ্ত বার্বেরিস

2,000	*Hainesii*
3,000	*Parkeriana*
3-10,000	*pseudoumbellata*
3-11,000	*asiatica*
5,000	*khasiana*
5-8,000	*chitria, Royleana*
5,500	*orthobotrys*
6,000	*manipurana, petiolaris*
6-7,000	*Wallichiana, insignis, lycium*
6-10,000	*aristata*
6-12,000	*Huegeliana, Zabeliana*
7,000	*nilghiriensis, tinctoria, Wightiana*
7-8,000	*Brandisiana, glaucocarpa, lycioides, praecipua, sublevis* var. *Praineana*

7,500	*affinis, ceratophylla, replicata* var. *dispar, sikkimensis*
8,000	*petiolaris*
8-9,000	*coriarea, Lambertii*
8-10,000	*calliobotrys*
8-12,000	*Edgeworthiana*
9,000	*glaucocarpa, kumaonensis, micropetala, sikkimensis, Zabeliana*
9-11,000	*Hookeri*
9-13-000	*Jaeschkeana*
9,500	*Osmastonii*
10,000	*affinis, dasyclada, Thomsoniana, virescens*
10-11,000	*Aitchisonii*
10-12,000	*bhutanensis, chrysosphaera, Cooperi, Duthieana, Griffithiana*
10-13,000	*umbellata, Usteriana*
11,500	*kashmirana, lasioclema*
12,000	*capillaris, concinna*
12-14,000	*macrosepala*
12,500	*himalaica, Ludlowii* var. *sakdensis*
13,000	*concinna, kumaonensis*
13-14,000	*ceratophylla*
14-16,000	*ulicina*

৩. বিভিন্ন জাতির বার্বেরিস আবিষ্কারের সময়

1821—*aristata, asiatica*

1822—*tinctoria*

1823—*chitria*

1824—*Wallichiana*

1831—*affinis, ceratophylla, floribunda, petiolaris, umbellata*

1834—*kunawarensis*

1837—*lycium*

1841—*coriarea*

1853—*concinna*

1855—*angulosa, insignis, macrosepala, ulicina*

1859—*Hookeri*

1862—*calliobotrys, orthobotrys*

1890—*virescens*

1893—*pachyacantha*

1905—*ceylanica, Giffithiana, Huegeliana, Jaeschkeana, Koehneana, kumaonensis, Usteriana, virescens* var. *ignorata, Wightiana, Zabeliana*

1908—*Duthiena, Edgeworthiana, Thomsoniana*

1912—*Parkeriana*

1918—*pseudoumbellata*

1920—*Osmastonii*

1921—*Lambertii*

1926—*glaucocarpa, lycioides*

1931—*micropetala, praecipua*

1938—*insignis* var. *tongluensis*

1939—*manipurana*

1940—*chrysosphaera*

1941—*bhutanensis, capillaris* var. *deleica, Cooperi, dasyclada, erythroclada, himalaica, insignis* var. *shergaonensis, insignis* var. *zelaica, lasioclema, Ludlowii* var. *sakdensis, macrosepala* var. *setiofolia, replicata* var. *dispar, Wallichiana* var. *gracilipes*

1942—*chitria* var. *occidentalis, Hainesii, kashmirana,*

khashiana, micrantha, petiolaris var. *garhwalana, umbellata* var. *Brianii, Walterana.*

৪. বিভিন্ন প্রদেশজাত মাহোনিয়া

1. Northern India	
(a) Bhutan	*Griffithii*
(b) Sikkim	*acanthifolia, sikkimensis*
(c) Nepal and Darjeeling	*acanthifolia, nepaulensis*
2. Southern India	*Leschenaultii*
3. Eastern India	
Assam	*acanthifolia, calamicaulis, manipurensis, pycnophylla, Roxburghii, Simonsii*
4. North-Western India	
Dehra Dun	*borealis*

৫. দেশবিদেশের বার্বেরিস জাতি প্রাপ্ত উপক্ষারের নাম

বার্বেরিসের জাতি	প্রাপ্তিস্থান	উপক্ষার
1. *B. vulgaris* L.	Europe	1 to 7*
2. *B. glauca* D.C.	,,	3
3. *B. buxifolia* Lam.	,,	3
4. *B. cretica*	,,	3
5. *B. lucida*	,,	3
6. *B. repens*	,,	3
7. *B. heteropoda* Sch.	Russia	1 to 6
8. *B. aetnensis* Presl.	Cyprus	3
9. *B. canandensis*	Canada	3

10. *B. nervosa* Pursh.	America	3
11. *B. Darwinii* Hook.	,,	3
12. *B. laurina* Billb.	,,	3, 8
13. *B. thunbergii* D.C. var. *Maximowiczii*	Japan	1, 2, 3, 5, 6 9 and 10
14. *B. asiatica* Roxb.	India	1 and 3
15. *B. Lycium* Royle	,,	3
16. *B. umbellata* Wall.	,,	11
17. *B. insignis* Hook.	,,	11
18. *B. aristata* D.C.	,,	3 and 4

৬. দেশবিদেশের মাহোনিয়া জাতি প্রাপ্ত উপক্ষারের নাম

1. *M. aquifolium* Nutt.	America	1, 2, 3*
2. *M. Swaseyi* Fedde	,,	2, 3
3. *M. trifoliolata* Fedde	,,	2, 3
4. *M. philippinensis* Nutt.	Philippine Islands	3, 5, 9
5. *M. nepaulensis* D.C.	India	11, 12
6. *M. Griffithii*	,,	1, 2, 3, 4, 12
7. *M. acanthifolia*	,,	1, 3, 4, 5, 12
8. *M. sikkimensis*	,,	1, 3, 12
9. *M. Leschenaultii*	,,	1, 3, 4, 5, 12
10. *M. Simonsii*	,,	1, 3, 4, 5, 12
11. *M. manipurensis*	,,	1, 3, 5, 12
12. *M. borealis*	,,	1, 3, 4, 5, 12

* 1-oxyacanthine, 2-berbamine, 3-berberine, 4-palmatine, 5-jatrorrhizine, 6-columbamine, 7-berberrubine, 8-hydrastine, 9-shobakunine, 10-oxyberberine, 11-umbellatine, 12-neprotine.

৭. দারুহরিদ্রাজাত উপক্ষার ও অণুর সংকেত

উপক্ষার	অণুর সংকেত		অণুর ভার
Berbamine	$C_{37}H_{40}O_6N_2$	...	608
Oxyacanthine	$C_{37}H_{40}O_6N_2$	...	608
Umbellatine	$C_{21}H_{25}O_8N$	...	419
Hydrastine	$C_{21}H_{21}O_6N$	...	383
Palmatine	$C_{21}H_{23}O_5N$	...	369
Neprotine	$C_{19}H_{23}O_6N$	...	361
Jatrorrhizine	$C_{20}H_{21}O_5N$	...	355
Columbamine	$C_{20}H_{21}O_5N$	...	355
Berberine	$C_{20}H_{19}O_5N$	...	353

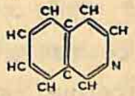
৮. পরিভাষাদি

অণু Molecule

অণুর গঠন Structure of the molecule

অণুর ভার Molecular weight

অণুর সংকেত Molecular formula

আইসোকুইনোলিন কাঠামো 

আত্তীকরণ Assimilation

উপক্ষার Alkaloid। ক্ষারের মত অত তীক্ষ্ণ নয়। তবে ক্ষারের মত কতকগুলি রাসায়নিক গুণ আছে। যেমন,

ক্ষার + অ্যাসিড ⟶ লবণ।

উপক্ষার + এসিড ⟶ উপক্ষার ঘটিত লবণ।

উপক্ষারগুলি বৃক্ষজাত। এগুলি কারবন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলিতে অক্সিজেনও বর্তমান থাকে। দারুহরিদ্রাজাত উপক্ষারগুলির অণুর সংকেত দেখলে তা বুঝা যায়। যেমন বার্বেরিন $C_{20}H_{19}O_5N$, অর্থাৎ বার্বেরিন উপক্ষারের একটি অণুতে কুড়িটি কারবনের পরমাণু, উনিশটি হাইড্রোজেনের পরমাণু, পাঁচটি অক্সিজেনের পরমাণু ও একটি নাইট্রোজেনের পরমাণু আছে।

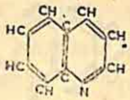
উপক্ষারের নামকরণ : যে গাছ থেকে উপক্ষার পাওয়া যায় তার দেশি বা লাতিন নাম ধরে উপক্ষারের নাম দেওয়া হয়। যেমন বার্বেরিস ভুলগারিস থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলে উপক্ষারের নাম বার্বেরিন দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময় একই গাছ থেকে দুইটি উপক্ষার পেলে গাছের নামের দুই অংশ থেকে উপক্ষারের নাম গড়ে নেওয়া হয়। ইআট্রর্হিজা পাল্মাটা (*Jatrorrhiza palmata*) গাছ থেকে প্রাপ্ত দুইটি উপক্ষারের নাম যথাক্রমে ইআট্রর্হিজিন (Jatrorrhizine) ও পালমাটিন (Palmatine)। আবার এই গাছ থেকেই আর একটি নূতন উপক্ষার পাওয়া গেলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল কলাম্বামিন (Columbamine), ঐ গাছটির দেশজ নাম কলম্বা বলে। এ ছাড়া, অনেক সময়ে গাছের ভেষজগুণ ধরেও উপক্ষারের নাম দেওয়া হয়। যেমন নার্কোটিন (Narcotine), নার্কোটিক (Narcotic) গুণ সম্পন্ন বলে। আবিষ্কর্তার নাম ধরে, উপক্ষারের নামকরণ হয়েছে পেলেটিয়ারিন (Pelletierine), পেলেটিএ (Pelletier) আবিষ্কৃত বলে। আবার উপক্ষারের বর্ণ ইঙ্গিত করেও নাম করা হয়েছে, যেমন নেপরোটিন,—(মাহোনিয়া) নেপালেনসিস জাত রক্তবর্ণের উপক্ষার।

এটিওলিত Etiolated

এটিওলিন Etiolin

ওরিয়েণ্টেল সোর Oriental sore. একজাতীয় ক্ষত, যা' প্রাচীন কালে কুষ্ঠ ক্ষত বলে লোকে সন্দেহ করত। আমাদের দেশে পঞ্জাব অঞ্চলে এই রোগ হতে দেখা যায়।

কাঠামো Skeleton

কুইনোলিন 'কাঠামো 

কোষ Cell

ক্ষার Alkali। চুন কিম্বা সোডাজাতীয় পদার্থ যা জলে দ্রবিত হয়, এবং সাবান গোলা জলের মত হাতে ঘষলে পিচ্ছিল হড়হড়ে ভাব হয়। রাসায়নিক মতে এক ফোঁটা ফিনলথ্যালিন দ্রব ক্ষারের দ্রবে মিশিয়ে দিলে গোলাপী রং উৎপন্ন হয়।

সংকেত Formula

গাছের গোত্র Genus

গাছের জাতি Species

গাছের বর্গ Family

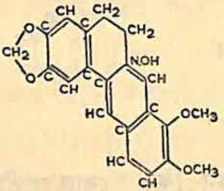
ট্রিপানোসোম Trypanosome ; একজাতীয় পরজীবী যার জন্য আফ্রিকায় বিখ্যাত "ঘুম রোগ", Sleeping Sickness, হয়।

ট্যান Tan

দারুহরিদ্রার বিভিন্ন নাম ইং Barberry লাতিন *Berberis*, আরবি আম্বার্বেরি। পারশি জরিষ্ক, জরুজ, জ়ুরক, জ়ুরঞ্জ ইত্যাদি। সংস্কৃত দারুনিশা, দারুরজনী, পীতদারু, পীতদ্রু, সৌবর্নি, দার্বী, কালেয়ক। হিন্দী দারহল্দ।

দ্রব Solution
নিষ্কাশন Isolation
পরজীবী Parasite
পরমাণু Atom
বিশ্লেষণ Analysis

বার্বেরিনের অণুর গঠন



রসাঞ্জনের নাম ইং Extract of *Berberis*, গ্রীক Lycium.
সংস্কৃত রসাঞ্জন। হিন্দী রসৌত।
রাসায়নিক গুণ Chemical property
রাসায়নিক যৌগিক Chemical compound
রাসায়নিক রূপায়ণ Chemical change
সংকেত Formula
সংশ্লেষণ Synthesis
হাইড্রাস্টিনিন—Hydrastinine। ক্যানাডায় প্রাপ্ত *Hydrastis canadensis* নামক গাছ থেকে hydrastine, $C_{21}H_{21}O_6N$ নামক এক উপক্ষার পাওয়া যায়। নাইট্রিক এসিড দিয়ে হাইড্রাস্টিন সিদ্ধ করলে, উপক্ষারটি বিভক্ত হয়ে hydrastinine, $C_{11}H_{13}O_3N$, নামক পদার্থ প্রস্তুত হয়। রক্তস্রাব নিবারণে হাইড্রাস্টিনিন বিশেষ ফলপ্রদ তাই ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। পরে বার্বেরিন উপক্ষার থেকেও হাইড্রাস্টিনিন তৈরি করা হয়।

৯. গ্রন্থ ও পত্রিকা স্বীকৃতি

১ Macdonell and Keith, Vedic Index of Names and Subjects, Vol. II.
২ Henry, The Plant Alkaloids, 1949.
৩ Shamsastry, Kautilya's Arthaśāstra, 1923.
8 Schoff, The Periplus of the Erythrean Sea, 1912.
৫ Garcia da Orta, Colloquies on the Simples and Drugs of India, 1563, translated from the third edition of the original book "Coloquios dos simples e drogas he cousas medicinais da India", in Portuguese.
৬ Silver Jubilee Brochure of Indian Chemical Society, 1924-1948.
৭ Dymock, Warden and Hooper, Pharmacographica Indica, 1881.
৮ Royle, An Essay on the Antiquity of Hindoo Medicine, 1837.
৯ Royle, Trans. Linn. Soc., 1837, *18,* 83.
১০ Perrins, J. Chem. Soc., 1862, *15,* 341.
১১ Orekhov, Arch. Pharm., 1934, 272, 673.
১২ Molinari's Chemistry, Vol. II, Part 2, 1923.
১৩ Pictet, Arch. Sci. Phys. Nat., 1905, *19,* 329.
১৪ Cromwell, Biochem. J., 1933, *27,* 860; Chatterjee, J. Amer. Pharm. Assoc., 1944, *33,* 205.
১৫ Buchner, Annalen, 1837, *24,* 228.
১৬ Watt, A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. I, 1889.
১৭ Chatterjee, J. Indian Chem. Soc., 1940, *17,* 289.
১৮ Chatterjee, J. Amer. Pharm. Assoc, 1944, *33,* 210.
১৯ Gupta and Kahali, Indian J. Med. Res., 1944, *32,* 53.

২০ গণনাথ সেন, আয়ুর্বেদ পরিচয়, পৃ ৫০।

২১ লাক্ষারেবতকুটজাশ্বমারকট্‌ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদমালত্য-
স্ত্রায়মাণাচেতি।—সুশ্রুত সংহিতা, সূ. স্থা., ৩৮শ অ। ৬৪ ॥
কষায়তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্তিনাশনঃ।
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ।৬৫।
হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকলশীকুটজবীজানি মধুকং চেতি।২৭।
এতৌবচাহরিদ্রাদিগণৌস্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতিসারশমণৌবিশেষাদ্দোষপাচনৌ।২৮।

২২ সুশ্রুত উল্লিখিত দারুহরিদ্রা বা রসাঞ্জনের মুখ্য ব্যবহারগুলি নিম্নে দেওয়া গেল :
মাগধৌমধুকংরোধ্রংকুষ্ঠমেলাহরেণবঃ। সুশ্রুত সংহিতা,
চি. স্থা. ৮ম অ। ৪৩ ॥
সমঙ্গাধাতকী চৈব সারিবা রজনীদ্বয়ম্।
প্রিয়ঙ্গব সর্জরসঃ পদ্মকং পদ্মকেসরম্।৪৪।
সুধাবচালাঙ্গলকী মধুচ্ছিটং সসৈন্ধবম্।
এতৎ সংভৃত্য সংভারং তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।৪৫।
এতদ্বৈগণ্ডমালাসু মণ্ডলেষ্বথ মেহিষু।
রোপণার্থহিতং তৈলং ভগন্দর বিনাশনম্।৪৬।
পীতদারু কষায়ং চ পিবেণ্মূত্রেণ সংযুতম্
বিমলাপনাদৃতে বাহপি শ্লেষ্মগ্রন্থি ক্রমোহিতঃ। ১৯শ অ।১৩॥
বচাদার্বী সর্ষপৈবা তৈলং বা নক্তমালজম্।২০ শ অ। ১৮ ॥
রজনীদারুসিদ্ধং বা সৈন্ধবেনসমাযুতম্।
সর্পিযুতং স্তন্যঘৃষ্টমঞ্জনং চ মহৌষধম্। সুশ্রুত সংহিতা, উ. ত., ৯ম অ। ২৩ ॥

কালেয়কে চাপি ঘৃতং বিপক্বং
হিতে চ তৎ স্যাদ্রজনী বিমিশ্রম্। ৪৪ম অ।৩১॥
সিন্ধূদ্ভূতং চক্রমর্দস্য বীজমিক্ষুদ্ভূতং কেশরং তার্ক্ষ্যশৈলম্।
পিষ্টো লেপোঽয়ং কপিত্থাদ্রসেন
দক্রুস্তূর্ণং নাশয়ত্যেষ যোগঃ। চি, স্থা., ৯ম অ।১৩॥
তদ্বত্তার্ক্ষ্যং মাসমাত্রং চ পেয়ং
তেনাজস্রং দেহমালে পয়েচ্চ। ৪৬।
মঞ্জিষ্ঠামদনং চণ্ডাত্রায়মাণা রসাঞ্জনম্। ৩৮ ম অ।২৬॥
নিরূহেষু যথা লাভমেষ বর্গো বিধীয়তে।২৮।
মধুনাতার্ক্ষ্যজম্…। উ. ত., ১২শ অ।১৮॥
সক্ষৌদ্রংবা রসাঞ্জনম্।১২শ অ। ২৩ ॥
ঘৃতংরসাঞ্জনং নার্যাঃ ক্ষীরেণ মধুসংযুতম্। ২১ম অ।৪৯॥
তৎপ্রশস্তং চিরাত্থেঽপি সস্রাবে পূতিকর্ণকে।৫০।
অঞ্জন রসাঞ্জন নাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপল
নলদনলিন কেশরাণি মধুকং চেতি। সূ. স্থা., ৩৮ শ অ।৪১॥
অঞ্জনাদির্গণোহ্যেষ রক্তপিত্তনির্বহণঃ
বিষোপশমোদাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরংভৃশম্।৪২।
রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপল্লবাঃ। চি, স্থা., ৮ম অ।৪১॥
ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তীকল্কোনাড়ীব্রণাপহাঃ।৪২।

২৩ চরক সংহিতায় সুশ্রুতোক্ত যে ব্যবহারগুলি আছে, সেগুলি বাদ দিয়ে. চরক উল্লিখিত রসাঞ্জনের অন্যান্য মুখ্য ব্যবহারগুলি দেওয়া হল :
মুস্তকুষ্ঠহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষকটুরোহিণী
চিত্রকচিরবিল্বহৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি।
চরকসংহিতা, সূ. স্থা., ৪র্থ অ।৩॥

দার্বীত্বচো যমানী চ··· ।১৩৭।
শ্লোকপাদেষভিহিতারোচনামুখশোধনাঃ ।১৩৮।
কুটজবিল্বচিত্রক নাগরাতিবিষভয়াধন্বাযাসক
দারুহরিদ্রাবচাব্যানীতি দশেমান্যর্শোঘ্নানি ভবন্তি। ৪র্থ অ ।১২॥

২৪ Hoernle, The Bower Manuscript, page lviii, 1893.
কণ্ঠরোগ প্রশমনঃ—রসাঞ্জনং দারুহরিদ্রিকা ত্বচন্তথা ভবেৎ
তেজবতী সপিপ্পলী সমানি কুর্য্যাৎ তুলিতানি বুদ্ধিমান্
জলেন পিষ্ঠা গুটিকা নিধাপয়েৎ। দ্বি. খ. ; ৪১॥

২৫ হরিদ্রাদ্বয় যষ্ঠ্যাহ্বকলশীকুটজোদ্ভবাঃ। অষ্টাঙ্গহৃদয়, ১৫শঅ। ৩৫॥
বচাহরিদ্রাদিগণাবামাতিসারনাশনৌ
মেদকফাঢ্যপবনস্তন্যদোষনির্বহণৌ। ৩৬।
বিল্বাহ্পমার্গব্যোষদার্বীস্থরালা বীজং শৈরীষং বার্হতং শৈগ্রবং চ।
সারোমাধুকঃসৈন্ধবংতার্ক্ষ্যশৈলংক্রটৌপৃথ্বীকাশোধয়ংত্যুত্তমাঙ্গম্। ৪।

২৬ দার্ব্যাদিকাথঃ। দার্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্বভল্লাতকৈরবিকৃতো-মধুনাকষায়ঃ। পীতোজয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং পীতাসিতারুণ বিলোহিত নীলশুক্লম্।
ত্রিফলাখদিরোদার্বীন্যগ্রোধাদিবলাকুশাঃ। নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়ঃ শোধনে হিতঃ। চক্রদত্ত।

২৭ মূর্বালাক্ষাহরিদ্রেদ্বেমঞ্জিষ্ঠাসেন্দ্রবারুণীবৃহতীসৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নামাংসী-শতাবরী। শার্ঙ্গধরসংহিতা, ৯ ম অ, দ্বি. খ., ৯৭॥
আরনালাঢকে তত্র তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্বজ্বরবিমোক্ষণম্। ৯৮।
রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া চ সমন্বিতম্। ১১ শ অ। ১৩৪।
সক্ষৌদ্রং লেপনংযোজ্যমুপদংশগদাপহম্। ১০৫।

২৮ Jolly, Indian Med. Gaz., 1911, *46*, 466.

২৯ Freund, British Chem. Abstracts, 1912, i, 383.

৩০ Natural History, xxiv, 77.

৩১ Chatterjee, Lloydia, 1949, *12*, 178.

৩২ অথখলুভগবন্তমমরবরমৃষিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবদাসং ধন্বন্তরিমৌপধেনববৈতরণৌরভ্রপৌষ্কলাবতকরবীর্য্য (র) গোপুররক্ষিতসুশ্রুতপ্রভৃতয়ঃ উচুঃ। সুশ্রুতসংহিতা, সূ. স্থা ১ ম অ। ৩॥

অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্বেদং পুনর্বসুঃ শিষ্যেভ্যোদত্তবান্ ষড্ভ্যঃ সর্বভূতানুকম্পয়ন। চরকসংহিতা, সূ. স্থা ১ম অ। ৩০ ॥

অগ্নিবেশশ্চভেডশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্বচঃ। ৩১।

ইত্যগ্নিবেশকৃতেতন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সূত্রস্থানেভেষজচতুষ্কে দীর্ঘঞ্জীবিতীয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়।

৩৩ De Candolle, Systema, 1821, ii, 8, 13.

৩৪ Mem. Mus. Paris, 1822, 306.

৩৫ Lindley, Bot. Reg., 1823, t 729.

৩৬ Prodrumus Regni Vegetabilis, 1824, i, 107.

৩৭ Gen. Syst. Gard., 1831, 115.

৩৮ Illust. Bot. Himal., 1834, 64 ; Trans. Linn. Soc., 1837, *17*, 94 ; Bot. Mag., 1841, *22*, t 46.

৩৯ Flora Indica, 1855, 226.

৪০ Flora of British India, Vol. I, 109.

৪১ Illust. Hort., 1859, t 207.

৪২ J. Linn. Soc., 1882, *19*, 150.

৪৩ Bot. Mag., 1890, t 7116.

৪৪ Dendrol., 1893, 170.

৪৫ Bull. Herb. Boiss., 1905, ser. 2, *5*, 33, 133, 391, 449, 655, 800 ; 1908, ser. 2, *8*, 192, 258.

৪৬ Fedde Rep., 1912, *11*, 162 ; A Forest Flora of the Punjab with Hazara and Delhi, 1918, 15 ; Kew Bull, 1920, 335 ; *ibid.*, 1921, 307 ; Bot. Mag., 1926, t 9102 ; Fedde Report, 1931, 248, 266.

৪৭ Ahrendt, J. Bot. Suppl., 1941 and 1942.

৪৮ Fedde, Engl. Bot. Jahrber., 1901, *31*, 124.

৪৯ Takeda, Notes Bot. Gard. Edin., 1911-17, *6*, 209.

৫০ Buchner, Annalen, 1837, *24*, 228.

৫১ Perkin, J. Chem. Soc., 1889, *55*, 632; 1890, *57*, 992.

৫২ Perkin, J. Chem. Soc., 1918, *113*, 764 ; 1925, *127*, 740.

৫৩ Wacker, Vjschr. prkt. Pharm., 1861, *10*, 545.

৫৪ Hesse, Berichte, 1886, *19*, 3190.

৫৫ Ruedel, Arch. Pharm., 1891, *229*, 631.

৫৬ Spaeth and Kolbe, Berichte, 1925, *58*, 2280 ; Annalen, 1926, 82 ; Santos, Chem. Abstracts, 1930, *24*, 1647.

৫৭ Spaeth and Polgar, Monats., 1929, *52*, 117.

৫৮ Neppach, Amer. J. Pharm., 1878, 373.

৫৯ Parsons, Pharm. J., 1882-83, *13* (iii), 46.

৬০ Schilbach, Wehmer's Die Pflanzenstoffe, 1929.

৬১ Arata, Rep. Pharm., 1892, 45.

৬২ Chopra etc., Indian J. Med. Res., 1929, *16*, 776.

৬৩ Kondo and Tomita, Arch. Pharm., 1930, *268*, 549.

৬৪ Castro etc., Univ. Philipp. Nat. Appl. Sci. Bull., 1932, *2*, 401.

৬৫ Orekhov, Arch. Pharm., 1933, *271*, 323.
৬৬ Cromwell, Biochem. J., 1933, *37*, 860.
৬৭ Klein, Hanbuch der Pflanzen Analyse, 1933, iv, 860.
৬৮ Gurguel etc., Bull. Assoc. Brasil Pharm., 1934, *15*, 11.
৬৯ Perrins, Pharm. J., 1862, (ii), *3*, 546.
৭০ Greathouse and Watkins, Amer. J. Bot., 1938, *25*, 743.
৭১ J. Pharm. Exp. Ther., 1940, *69*, 64.
৭২ Chatterjee and Guha, J. Amer. Pharm. Assoc., 1950, *39*, 181 ; Science and Culture, 1949, *15*, 163 ; Chatterjee, D.Sc. Thesis, Cal. Univ. 1946 ; Guha, D. Phil. Thesis, Cal. Univ. 1950.
৭৩ Siddiqui etc. J. Sci. and Ind. Res., 1950, 9B, 161.
৭৪ McNair, Amer. J. Bot., 1931, *18*, 418 ; 1934, *21*, 427.
৭৫ Karrer, Organic Chemistry, 1946.
৭৬ Chatterjee, J. Amer. Pharm. Assoc., 1943, *32*, 1 ; Guha, D. Phil. Thesis, Cal. Univ., 1950.
৭৭ Konovalova and Magidson, Arch. Pharm., 1928, *226*, 449.
৭৮ Cromwell, Biochem. J., 1937, *31*, 551 ; 1943, *37*, 717, 722.
৭৯ Robinson, J. Chem. Soc., 1917, *111*, 878.
৮০ Schopf, etc., Annalen, 1932, *497*, 22 ; 1934, *512*, 190 ; 1935, *518*, 1 ; 1940,*544*, 1 ; Angew. Chem., 1937, *50*, 779, 797.
৮১ Chatterjee, J. Amer. Pharm. Assoc., 1944, *33*, 205.

৮২ Sabatini, Bull. Attidr. Acad. Med. Roma, 1928, *54*, 5.

৮৩ Brahmachari, Indian Med. Gaz., 1944, *79*, 259.

৮৪ Seery and Bieter, J. Pharmacol. and Exp. Ther., 1940, *69*, 64.

৮৫ Dick, Arch. Surg. Chicago, 1940, *41*, 287.

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১৸০

পঞ্চম সংস্করণ। নবম মুদ্রণ

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ১৸০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩।০

নবপ্রকাশিত

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১৸০

নবপ্রকাশিত